গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১৩ - ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

ভোট চাইবার আগে কংগ্রেস বলুক, তারা সিপিএমের সমর্থন নেবে না

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

লালগড়ে সিপিএম যে নৃশংসভাবে হত্যা করাল তার প্রতিবাদে আজ আমাদের ডাকে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় বনধ্ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। ট্রেন আমরা আটকাইনি। ট্রেন চলেছে। বাকি সমস্ত যানবাহন বন্ধ ছিল। কোর্ট, সরকারি অফিস অধিকাংশ বন্ধ ছিল, কোথাও কোথাও ৭-৮ শতাংশ উপস্থিতি ছিল। স্কুল-কলেজ, হাটবাজার বন্ধ ছিল। সাঁওতালডির কোল ওয়াসারিতে ৯০ শতাংশ অনুপস্থিত ছিল। থার্মাল পাওয়ারেও ১০ শতাংশ উপস্থিতি ছিল। পারবেলিয়া কয়লাখনিতে ১৫-১৭ শতাংশ উপস্থিতি ছিল। তিনটে জেলাতেই সব কিছু বন্ধ ছিল। মেদিনীপুর কালেক্টরেটের সামনে আমাদের কর্মীদের উপর সিপিএম হামলা চালায়, জনগণ প্রতিরোধ করলে চলে যায়। পুলিশও লাঠিচার্জ করে। ২২ জানুয়ারি বন্ধের পর এত অল্প সময়ের ব্যবধানে আর একটা বনধ্ সত্ত্বেও অত্যাচারিত-নিপীড়িত জঙ্গলের আদিবাসীদের সমর্থনে জনগণ যেভাবে দাঁড়িয়েছে এবং বনধ্কে সফল করেছে, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। এই আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিপিএম-এর ক্রিমিনাল রাজনীতি এত দূর গিয়েছে যে, ৩ ফেব্রুয়ারি জনগণের কমিটি খাসজঙ্গল নামে একটি গ্রামে যখন মিটিং করছিল, সেখানে সিপিএমের ক্রিমিনালরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং পুলিশ সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় ও গুলি চালায়। তাদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে যিনি নিহত হয়েছিলেন, তাঁর মৃতদেহও সঙ্গে নিয়ে আসে এটা দেখানোর জন্য যে, তারা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিল, আর তার উপর হামলা চালানো হয়েছে। ফলে সিপিএমের আক্রমণ ছিল পূর্বপরিকল্পিত। এই ক্রিমিনালদের আক্রমণে বাবা এবং ছেলে দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আর একজন হাসপাতালে মারা যান। দু'জন গুরুতরভাবে আহত। তাদের মধ্যে একজন মহিলা। আহতদের কাছে জেলার ডিএসপি গিয়েছিলেন লিখিতভাবে এই কথা আদায় করার জন্য যে, আন্দোলনের লোকেরাই গুলি চালিয়েছে এবং তাতেই তাঁরা আহত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এ ধরনের বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা আমাদের জেলা পার্টিকে ফোন করে সব জানান। আমাদের পার্টিকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। ততক্ষণে ডিএসপি পালিয়ে গেছেন। আমরা আন্দোলনকারীদের বলেছি, দু'জন আহত ব্যক্তিকে দিয়ে ডি এস পি-র বিরুদ্ধে মামলা করাতে। মেদিনীপুর কোর্টের ল'ইয়ার অ্যাসোসিয়েশন এদের পক্ষে দাঁড়াবে বলে কথা দিয়েছে। এই হল সিপিএমের ক্রিমিনাল পলিটিক্স। এভাবেই 'সংবাদ প্রতিদিনে'র বর্ধমানের সাংবাদিককে ডেকে নিয়ে গিয়ে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। বশংবদ পুলিশ অফিসাররাই এই কাজগুলি করে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, রাজ্যবাসী অনেকে হয়ত জানেন না জঙ্গলের সমস্যাগুলো। ওখানকার মানুষ একটা দাবি তুলেছে, আমরাও তুলেছি, তা হচ্ছে সমস্ত পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিতে হবে। অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের ক্ষমা চাইতে হবে। এছাড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

লালগড় আন্দোলনের শহিদ

১। নির্মল সর্দার
২। রাজারাম মান্ডি
৩। লখীন্দর মান্ডি
৪। গোপীনাথ মান্ডি

৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই-এর ডাকে তিন জেলায় সর্বাত্মক বন্ধ

নামমাত্র ভাড়া কমিয়ে সরকার জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করল

দু'দফায় তেলের দাম কিছুটা হলেও কমার পর রাজ্যের সাধারণ মানুষ যখন নিশ্চিত ছিলেন যে বাসের ভাড়া উপযুক্তভাবে কমবে, তখন রাজ্য সরকারের নামমাত্র ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যবাসীকে প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। ট্রামে-বাসে-ট্রেনে-চায়ের দোকানে সর্বত্র মানুষ আলোচনা করছে, তেলের দাম বাড়লে যদি রাতারাতি বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তেলের দাম কমলে সেই হারে ভাড়া কমানো হবে না কেন? তেলের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাসের ভাড়া কমালে মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি-ছাঁটাইয়ে জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবনে যতটুকু সুরাহা হত, রাজ্য সরকার তথা সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করলেন কেন? তা কি বাসমালিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য — যাতে আগামী নির্বাচনে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া যায়?

গত বছর জুন মাসে ডিজেলের দাম এ রাজ্যে বেড়েছিল ১ টাকা ৬২ পয়সা। সরকার সাত তাড়াতাড়ি বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা তখনই দেখিয়েছিলাম, যাত্রী ভাড়া যে পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে, তেলের দাম বাড়ায় খরচ যা বেড়েছে তা তার থেকে অনেক বেশি। হিসাব করে দেখা গেছে, যেখানে ১৫ পয়সা ভাড়া বাড়ালেই চলত, সেখানে সরকার প্রায় এক টাকা ভাড়া বাড়িয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় ৭ গুণ ভাড়া বাড়িয়েছিল। ফলে বাস মালিকদের লাভ আগের থেকেও বেড়ে যায়।

এরপর ডিসেম্বর মাসে প্রথম দফায় তেলের দাম কমে ডিজেলে লিটার পিছু ১ টাকা ৮৯ পয়সা। অর্থাৎ জুন মাসে দাম যতখানি বেড়েছিল তার থেকেও কমে যায়। ফলে ভাড়া জুন মাসের থেকেও কমে যাওয়ার কথা, অন্তঃত পক্ষে পুরনো ভাড়ায় ফিরে যাওয়ার কথা। একটি সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বিন্দুমাত্র ভাবলে তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজ্যের মানুষ বিস্ময়ের সাথে দেখল যে, যন্ত্রাংশ, মবিল প্রভৃতির দাম বাড়ার অজুহাত তুলে মালিকদের ভাড়া না কমানোর আবদারের কাছে নতিস্বীকার করে সরকার বলল, এখনই বাসের ভাড়া কমানো সম্ভব নয়। তেলের দাম আরও কমলে ভাড়া কমানো হবে।

বাস্তবিক ভাড়া কমানোর প্রশ্ন উঠলেই মালিকরা যন্ত্রাংশের দাম বৃদ্ধির অজুহাত তোলে, অন্য সময় তারা এ কথা বলে না বা এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দাম বাড়ানোর কোনও অভিযোগ করে না। যন্ত্রাংশের দাম কতখানি বাড়ছে, তাতে তাদের দৈনিক খরচ কী পরিমাণে বাড়ছে তারও কোনও হিসাব তারা কখনও প্রকাশ্যে রাখে না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, যন্ত্রাংশের দাম বাড়ার কথা আসলে ভাড়া না কমানোর ক্ষেত্রে অজুহাত মাত্র, যা মালিক এবং সরকার উভয়ের স্বার্থই রক্ষা করে, বলি দেয় সাধারণ মানুষের স্বার্থকে।

এরপর ফেব্রুয়ারিতে আবারও একদফা জ্বালানি তেলের দাম কমল। দু'দফায় দাম কমে এ রাজ্যে লিটার পিছু ডিজেলের দাম কমল ২ টাকা ৮৯ পয়সা। অর্থাৎ জুন মাসের ১ টাকা ৬২ পয়সা দাম বাড়ার আগের থেকেও লিটার পিছু ১ টাকা ১৭ পয়সা দাম কমে গেল। কিন্তু সরকার ভাড়া যা কমাল তা নামমাত্র। প্রথম স্টেজ চার কিলোমিটার পর্যন্ত। এই স্টেজেই যাত্রীসংখ্যা সব থেকে বেশি। অথচ এই স্টেজে ভাড়া কমানো হল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ যাত্রীকেই তেলের দাম কমার কোনও সুবিধা পেতে দেওয়া হল না। তাদের অতিরিক্ত

দুয়ের পাতায় দেখুন

৯ মার্চ থেকে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে

কলকাতায় লাগাতার অবস্থান

দাবি ঃ ১। কালোবাজারি বন্ধ করে সস্তা দরে সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ, কেরোসিন তেল সরবরাহ করতে হবে; ২। ট্যাক্স ফ্রি ডিজেল ও তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিতে হবে; ৩। গ্রামীণ মজুরদের ১০০ দিনের কাজ নতুবা সম্পূর্ণ মজুরি দিতে হবে; ৪। ধান, আলু ও পাটসহ সকল কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; ৫। রেশন কার্ড, বি পি এল তালিকা তৈরি ও রেশন সাপ্লাইয়ের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে; ৬। লালগড় সহ রাজ্যের সমস্ত আদিবাসী ও গরিব মানুষের উপর লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, বঞ্চনা বন্ধ করতে হবে; ৭। কালোবাজারি ও মজুতদারি দমন করে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য নির্দিষ্ট সস্তা দরে সরকারকে দিতে হবে; ৮। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি ও বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে; ৯। কৃষিজমি ধ্বংস করা বন্ধ করতে হবে; ১০। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি ও খাজনাবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে; ১১। মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দিতে হবে; ১২। বন্যা, খরা ও নদী-ভাঙনের আক্রমণ থেকে গ্রামাঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে; ১৩। গ্রামীণ গরিবদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে; ১৪। পুলিশি জুলুম ও নারীপাচার বন্ধ করতে হবে।

৯ মার্চ কলকাতায় গণঅবস্থানের সমর্থনে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থানার তেমাথানিতে ৬ ফেব্রুয়ারি জনসভা, প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির প্রথম কলকাতা জেলা সম্মেলন

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ, সাপ্তাহিক ছুটি, পরিচয়পত্র, বিপিএল কার্ড প্রদান, বিনা খরচে সন্তানদের পড়াশুনা, বার্ধক্যভাতা, বিনাব্যয়ে চিকিৎসা, পরিচারিকাদের উপর ক্রমবর্ধমান মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ২৯ জানুয়ারি মৌলালি যুবকেন্দ্রে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কলকাতা জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিচারিকাদের জীবন-সংগ্রামের উপর রচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সীতা পড়ুয়া। কলকাতা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন শতাধিক পরিচারিকা মা-বোন সম্মেলনে যোগ দেন।

অকালে মৃত পরিচারিকাদের স্মরণে একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট ও মূলপ্রস্তাব পাঠ করেন সভানেত্রী পার্বতী পাল এবং বুলবুল আইচ। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলার অন্যতম সংগঠক রাধা মিত্র ও তনুশ্রী শাসমল। ঊষা হালদার, অন্নপূর্ণা দাস, স্বপ্না মণ্ডল, মেনকা রক্ষিত, ছবি দাস, রেখা নস্কর, শ্যামলী নস্কর, প্রতিমা সরদার প্রমুখ পরিচারিকারা তাঁদের জীবনের ব্যথা-বেদনার কথা তুলে ধরেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার। তিনি পরিচারিকাদের জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি তুলে ধরেন এবং তাঁদের সমিতির কাজের সাথে আরও নিবিড় সংযোগ সাধন করে দাবি আদায়ের আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী সুজাতা ব্যানার্জী। তিনি পরিচারিকাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির রাস্তা কী তা ব্যাখ্যা করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা লিলি পাল, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদিকা প্রণতি কর এবং অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য নেতা দীপক দেব। রেখা গোস্বামীকে সভানেত্রী ও বুলবুল আইচকে সম্পাদিকা করে ৪০ জনের এক শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার।

সরকার জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করল

একের পাতার পর

ভাড়া দিতেই বাধ্য করা হল। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ সরকারের এই আচরণে প্রবল ক্ষুব্ধ। এ কথা সর্বত্রই উঠছে যে, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে একটি সরকার কতখানি নিস্পৃহ হলে, সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে তোয়াক্কা না করার মনোভাব থাকলে তবে এমন বেপরোয়া আচরণ করতে পারে।

কিন্তু জনসাধারণ সম্পর্কে সরকারের এই প্রতারণামূলক আচরণের কারণ কী? কীসের জোরে সরকার এ জিনিস চালিয়ে যেতে পারছে?

জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে আজ মালিকদের উপরই বেশি নির্ভর করছে। নির্বাচনে জিততেও জনসমর্থন নয়, মানি পাওয়ার-মাসল পাওয়ার-প্রোপাগান্ডা পাওয়ারকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করছে। তাই একদিকে টাটা-বিড়লা-সালিম-গোয়েঙ্কা-আম্বানিদের স্বার্থের কাছে রাজ্যের কৃষক সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তেমনই সাধারণ যাত্রীস্বার্থকেও বাসমালিকদের স্বার্থের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে।

যাত্রীস্বার্থ নিয়ে সরকারের এই বেপরোয়া আচরণের আরও একটি কারণ হল, সরকার নিজেই এক বিরাট বাসমালিক। জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সরকার নিজেই বাসের ব্যবসা চালাচ্ছে। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, ভূতল পরিবহণ নিগম প্রভৃতি নামে সরকার প্রচুর বাস চালায়। এর মধ্যে সাধারণ বাস নামমাত্র, প্রায় সবই স্পেশাল, একজিকিউটিভ, লিমিটেড স্টপ, সুপার প্রভৃতি নানা নামধারী বাস, যার সবগুলিতেই ভাড়া সাধারণ বাসের থেকে বেশি। অর্থাৎ এমনিতেই সরকার যাত্রীদের থেকে অনেক বেশি টাকা আদায় করে। তাই সাধারণ বাস মালিকদের মতো সরকারেরও ভাড়া কমাতে অনীহা এবং বাড়াতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। দুঃখের বিষয় হল, এরপরও উপরোক্ত সংস্থাগুলির প্রায় প্রতিটিই বছরের পর বছর ধরে লোকসানে চলছে। বেসরকারি বাস মালিকরা যেখানে একটি বাসের মুনাফায় ধীরে ধীরে একাধিক বাস কিনছে, তখন পরিবহন দপ্তরের লোকসান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আসলে, দক্ষ পরিচালনার অভাব, কর্মীদের একাংশের দুর্নীতি, মাথাভারি প্রশাসন, অপচয় এবং দলীয় আনুগত্য দেখে কর্মী নিয়োগ, সর্বোপরি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতিই ওই সংস্থাগুলির এই ক্রমাগত লোকসানের কারণ। ফলে একদিকে যাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে সরকারি অপদার্থতায় লোকসানের বহর বেড়েই চলেছে, যাত্রী হিসাবে সাধারণ মানুষ ন্যূনতম পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

এইভাবে সরকার নিজের অপদার্থতা ঢাকতে সুযোগ পেলেই ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা যাত্রীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এতে একদিকে যেমন সরকারের দুর্নীতির ও দলবাজির সুযোগ বাড়ে, তেমনই বাস মালিকদেরও খুশি করে সরকারে থাকার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ‘সাহায্যটা’ আদায় করা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই এই দাবি আজ প্রবলভাবে উঠেছে যে, যে সরকার নিজেই পরিবহণকে ‘পরিষেবা’ থেকে ‘ব্যবসায়’ পরিণত করেছে, সেই সরকারের হাতে যাত্রীভাড়া নির্ধারণের দায়িত্ব আদৌ থাকা উচিত নয়। এর ফল যে কী মারাত্মক হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষ আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আমরা বহু আগে থেকেই এই দাবি তুলছি, আজ সর্বস্তর থেকেই উঠছে যে, এ ব্যাপারে যাত্রী সমিতি, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে নিয়ে কমিটি গড়ে তার মাধ্যমেই যাত্রীভাড়া নির্ধারণ করা হোক।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই বালি আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড শফিউর রহমান ২৪ জানুয়ারি রাত ৯টায় নদিয়া জেলা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। ঐদিনই বেলা ২টা নাগাদ হৃদযন্ত্রের গোলযোগ এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরদিন তাঁর মরদেহ দলের জেলা অফিসে পৌঁছালে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ জানান। জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড জাকিমউদ্দিন এবং ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। ৩ জানুয়ারি শ্যামনগর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কমরেড শফিউরের স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড খোদাবক্স। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট মানুষরা এই সভায় স্মৃতিচারণা করে বলেন, নির্লোভ, নির্ভীক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক ছিলেন শফিউর। নিজে অত্যন্ত দুঃস্থ-অভাবী পরিবারের হলেও বহুদিন ঘরের জন্য চাল কিনতে দোকানে গিয়ে অন্য কোনও পীড়িত বা দুঃস্থ মানুষকে চাল কেনার পয়সাটা দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে সারাদিন না খেয়ে থেকেছেন। এসব নিয়ে কোনও রকম আক্ষেপ তাঁর ছিল না। অভাবী বলে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে গেলে দাতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তা তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন — তাঁর আত্মমর্যাদার জায়গাটা ছিল এমন। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এই এলাকা নারীপাচার চক্র ও ক্রিমিনালদের যখন স্বর্গরাজ্য, বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা যেখানে ভোট হারানো এবং প্রাণের ভয়ে ভীত, সেখানে কমরেড শফিউর অসীম সাহসে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং পাচার হয়ে যাওয়া দু’জন নারীকে কাশ্মীর থেকে উদ্ধার করে এনেছেন।

কমরেড শফিউর রহমান লাল সেলাম

পিটিটিআই সংকট ঃ কোথায় গেল সরকারি প্রতিশ্রুতি?

পিটিটিআই সংকট সমাধানের পরিবর্তে আরও ঘোরালো হচ্ছে। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কেউই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া দরকার তার ধারে কাছেও যাচ্ছে না। কী কী পদক্ষেপ নিলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে? কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে পিটিটিআই ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটগুলি বৈধ ঘোষণা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার নানা বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু অর্ডিন্যান্স জারি করেছে। এক্ষেত্রে ৭৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনজীবিকা রক্ষার্থে কেন অর্ডিন্যান্স জারি করা যাবে না? কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের দ্বারা সৃষ্ট এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একবারের জন্য বৈধতার নিয়ম শিথিল করতে পারে। পিটিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণরত এই ছাত্রছাত্রীদেরকে আনট্রেন্ড হিসাবে স্পেশাল ক্যাটাগরিতে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কেউই এ বিষয়ে তৎপর হচ্ছে না।

পিটিটিআই সমস্যা আদৌ ছাত্রদের দ্বারা সৃষ্ট কোনও সমস্যা নয়। এন সি টি ই’র নিয়ম লঙ্ঘন করে ছাত্র ভর্তি নিয়ে রাজ্য সরকার এই সমস্যা তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারও দীর্ঘকাল উদাসীন থেকে রাজ্য সরকারকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে দিয়েছে। ফলে, এই সমস্যার জন্য দুই সরকারই দায়ী। তাহলে ছাত্ররা তার জন্য শাস্তি পাবে কেন?

২ জানুয়ারি ধর্মতলায় এক হাজার পিটিটিআই ছাত্রছাত্রী আনন্দ হান্ডা, প্রবীর ঘোষ, অশোক রুদ্র প্রমুখের নেতৃত্বে অনশনে বসেছিল। ৪৮ ঘণ্টা অনশন চলার পর বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। একমাস পার হয়ে গেল, এখনও তিনি এবিষয়ে তৎপর হননি। তাঁর নিষ্ক্রিয়তা এবং উদ্যোগহীনতায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। ছাত্রছাত্রীদের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও ঘটছে। ৫ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্টবেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলার স্কুল শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করা হয়। বহু জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে ছাত্ররা। শিলিগুড়িতে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাদের প্রতারণা করার অভিযোগ এনে স্কুল শিক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফ আই আর করে। বহু জায়গায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ৬৫ জন পিটিটি ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। ছাত্রদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি এস ও রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। পিটিটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি বিকাশ ভবন ঘেরাও এবং ১০ ফেব্রুয়ারি মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সারা বাংলা প্রাণীবন্ধু কনভেনশন

প্রাণীবিকাশ দপ্তরের ট্রেনিংপ্রাপ্ত পশ্চিমবাংলার ৩ হাজার যুবক, যাঁরা বর্তমানে সরকারি গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থার অধীনে গো-প্রজনন সহ সাধারণ পশুচিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, সরকারি ভাষায় তাঁদের প্রাণীবন্ধু বলা হয়। তাঁদের সরকারি নিয়মে নির্দিষ্ট কোটায় কাজ করতে হয় এবং তার রিপোর্ট প্রাণীবিভাগ দপ্তরে জমা দিতে হয়। এঁরা কোনও বেতন পান না, এঁদের কোনও পরিচয় পত্রও নেই। তার উপর এঁদের দিয়ে এক চুক্তি করিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা প্রাণীবিকাশ দপ্তরে চাকুরির আবেদন করতে পারবেন না। এই কালাচুক্তির বিরুদ্ধে এবং সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য দাবিতে ২৮ জানুয়ারি কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে সারা বাংলা প্রাণীবন্ধু কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিক প্রাণীবন্ধু এতে অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক দেব, কনভেনশনের সভাপতি শান্তি ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুকুমার সরদার, মালদার মহঃ রায়েজ উদ্দিন, বিষ্ণুপুরের গোবিন্দ গোপাল ঘোষ, বাসন্তীর ইকবাল আহমেদ সরদার প্রমুখ। কমরেড শান্তি ঘোষকে সভাপতি ও কমরেড ইকবাল আহমেদ সরদারকে সম্পাদক করে সারা বাংলা প্রাণীবিকাশ কর্মচারী ইউনিয়ন গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে

সরকার বলছে তারা দুধে-ভাতে আছে

বিশাল বিশাল হোর্ডিং, সংবাদপত্র এবং টিভি-র বিজ্ঞাপনে রাজ্যের সিপিএম সরকার তাদের তিন দশকেরও বেশি শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের অতি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছে। কাস্তে হাতে কৃষক ও কৃষক রমণীর হাসিমুখ, বইপত্র হাতে স্বাস্থ্যবান গ্রামীণ শিশু। যেন পশ্চিমবাংলার মানুষ কত সুখেই না আছে! সেই সুখের ঠ্যালায় কৃষকরা এ রাজ্যে আত্মহত্যা করছে, প্রতি বছরই বাড়ছে আত্মহত্যার হার।

সিপিএম তাদের মুখপত্র ‘গণশক্তি’তে বেশ ফলাও করে প্রচার করে — অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু এই প্রচারের আড়ালে তারা সযত্নে গোপন রাখে এ রাজ্যের কৃষকদের দুর্দশা তথা ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকে। বীজ, সার, কীটনাশকের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে কৃষকের চাষের খরচ বেড়েই চলেছে। উৎপন্ন ফসল বাজারে নিয়ে গিয়ে কৃষক তার ফসলের ন্যূনতম দামটুকুও পাচ্ছে না। কৃষকের ঘামে-রক্তে উৎপাদিত ফসল ফড়ে ও দালালদের হাতে নামমাত্র দামে চলে যায়। তারপর সরকার ‘সহায়ক মূল্যে’ ফসল কেনার নাটক করতে বাজারে নামে। কৃষক বাঁচবে কী করে?

কৃষকরা ঋণ নিয়ে চাষ করছে। সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার নানা জটিলতার কারণে বেশিরভাগ কৃষকই ঋণ করে মহাজনের কাছে এবং তা চড়াসুদে। ফসল বেচে সুদ সহ ঋণ পরিশোধ করবে, সারা বছরের সংসার খরচ সংগ্রহ করবে — এই হল স্বপ্ন। তাদের সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ। ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে অসহায় কৃষকরা। সরকার দাঁড়াচ্ছে না এই বিপন্ন কৃষকদের পাশে। তাহলে, ঋণের টাকা ও তার সুদ কী করে পরিশোধ করবে, কী করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার খাওয়া-পরা-চিকিৎসার খরচ জোগাড় করবে — এই চিন্তায় তারা দিশেহারা। কংগ্রেস-বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যের অসহায় কৃষকদের মতো এ রাজ্যের কৃষকদেরও অনেকে তাই বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আত্মঘাতী কৃষকদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হল।

পশ্চিমবঙ্গে আত্মহত্যাকারী কৃষকের তালিকা

২০০২ সালে কোচবিহারের করলা চাষি রামেশ্বর বর্মন।

২০০৩ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা টাউন থানার আলুচাষি শিবহরি চৌধুরী।

২০০৪ সালে রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ বর্ধমানে জামালপুরের আলুচাষি সৈফুদ্দিন চৌধুরী, মেমারি ব্লকের আলুচাষি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কালনা ব্লকের আলুচাষি যুধিষ্ঠির দেবনাথ।

২০০৬ সালে বর্ধমানে রায়না-২নং ব্লকের আলুচাষি কাশীনাথ পান, মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিনয় রায়, হুগলির আরামবাগে উত্তম কুণ্ডু সপরিবারে।

২০০৭ সালে বর্ধমানে জামালপুরের আলুচাষি অরবিন্দ নাথ ঘোষ ও সেখ করিম, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের আলুচাষি কার্তিক পাল, মেদিনীপুরে গোয়ালতোড়ের আলুচাষি নিতাই কুণ্ডু, বর্ধমানের মেমারি ব্লকের সেখ সোরাবউদ্দিন, উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের লঙ্কাচাষি ভূপেন দাস।

২০০৮ সালে বর্ধমানে মঙ্গলকোটের দীর্ঘসুয়া গ্রামের আলুচাষি নিমাই রজক (১৭ ফেব্রুয়ারি), বর্ধমান থানার আমরা গ্রামের আলুচাষি জগন্নাথ ঘোষ (৭ মার্চ), বর্ধমানের মেমারি পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের আলুচাষি লালন মল্লিক (২১ মার্চ), পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা টাউন-২নং ব্লকের মহিষঘোট গ্রামের আলুচাষি তপন রায় (২৫মার্চ), বাঁকুড়ার রাধানগর পঞ্চায়েতের ভাটরা গ্রামের আলুচাষি মধুসূদন নন্দী (২৭ মার্চ), বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার সিজনা গ্রামের আলুচাষি ধানু দলুই (২৯ মার্চ), উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের মহারাজা গ্রামের গম-ভুট্টা-ধান চাষি ভুবন বর্মন (২১ এপ্রিল), বর্ধমানের গলসি থানার বড়দিঘি’র ধানচাষি অনিমা বেগম (২০ মে), বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার বালিঠা গ্রামের আলুচাষি সুমন্ত নায়েক (৬ জুন), বর্ধমানের মেমারি ব্লকের সাতগাছিয়া-২ পঞ্চায়েতের নান্দিয়ারা গ্রামের সুনীল সরকার (২৯ সেপ্টেম্বর) আত্মঘাতী হয়েছেন।

২০০৯ সালের শুরুতে গত ৯ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় থানার হুমগড় এলাকার শান্তশীল পণ্ডা আত্মঘাতী হয়েছেন।

রাজ্যের কৃষকদের সুখে থাকার এই তো দৃষ্টান্ত। রাজ্য সরকারের কাছে এই সুখ চেয়েছে কৃষকরা? সরকার টাটা কোম্পানিকে প্রায় হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছে, অন্যান্য কোম্পানিকেও বিপুল অর্থ ছাড় দিয়ে যাচ্ছে, চোলাই মদের কারবারিদেরও পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেবে বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু বিপন্ন কৃষকদের বাঁচানোর প্রশ্নে তারা প্রচার করছে — এ রাজ্যের কৃষকরা নাকি বেশ সুখে-শান্তিতে আছে, তাদের নাকি ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। আবারও স্পষ্ট হয়ে যায়, সিপিএম সরকার কাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার — মালিকদের নাকি কৃষকদের।

সেচের প্রশ্নেও সরকার মিথ্যাচার চালাচ্ছে

স্বাধীনতা লাভের পর ছয় দশকেরও বেশি কেটে গিয়েছে। প্রথমে কংগ্রেস সরকার, পরে সিপিএম সরকারের শাসন চলছে এ রাজ্যে। তবু, চাষের জন্য কৃষকদের কার্যত তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে, প্রকৃতির করুণার দিকে। কেন এই দুরবস্থা — তার জবাব তো দিতে হবে কংগ্রেস এবং সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীদের। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে সিপিএম সরকার ও তার মন্ত্রীরা সমানে বলে চলেছেন, এ রাজ্যের ৭০ শতাংশ জমিতে নাকি সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। প্রকৃতপক্ষে, সেচ ব্যবস্থা আছে রাজ্যের ৩০ শতাংশেরও কম জমিতে। সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত এই জমিতে বছরে যতবার চাষ হচ্ছে, একই জমিকে ততবার দেখিয়ে সরকার কৌশলে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ দেখাচ্ছে। আবার, সেচের যতটুকু ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা কতটুকু? সরকার তার জন্য কী করেছে? এই সেচের শতকরা ৮০ ভাগই কৃষকরা করেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ৭-৮ লক্ষ অগভীর নলকূপ বসিয়ে তারা চাষের কাজ চালাচ্ছে।

নদীর জলকে সেচের কাজে লাগানোর লক্ষ্যে নদীসেচ প্রকল্পের কী করেছে সরকার, তাদের ৩২ বছরের শাসনে? তিস্তা সেচ প্রকল্পের কথা কয়েক দশক ধরে রাজ্যের মানুষকে শোনানো হচ্ছে। সুবর্ণরেখা সেচ প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকার আজও ‘কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না’ বলে শুনিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কেন টাকা দিচ্ছে না, কেন কৃষকদের প্রতি কংগ্রেসের এই বঞ্চনা — সিপিএম তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছে না। বছর চারেক ধরে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সংসার করার সময় তারা একবারও কিন্তু এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেনি, কারণ কংগ্রেস তাদের মিত্রশক্তি।

ডিজেল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি এ রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি

সেচসেবিত এলাকায় সেচের জল পেতে অগভীর নলকূপ চালাতে হয়। সেজন্য চাই ডিজেল, চাই বিদ্যুৎ। সেখানেও সরকারি আক্রমণ ভয়ঙ্কর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স বসিয়ে রেখেছে ডিজেল সহ অন্যান্য জ্বালানি তেলের উপর। তার উপর তেল কোম্পানিগুলোর বিপুল মুনাফা লুঠের সুযোগ করে দিতে তারা সর্বদাই তৎপর। তার ফলে, বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সারা দেশজুড়ে ঘটছে। কিন্তু এ রাজ্যে সিপিএম সরকার বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে সবচেয়ে বেশি। ফলে, রাজ্যের কৃষকরা মারাত্মক সমস্যায় ভুগছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ডিজেলে লিটার পিছু ২ টাকা হারে দাম কমানোর কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও সিপিএম সরকারের ট্যাক্সবৃদ্ধির কল্যাণে এ রাজ্যে দাম কমেছে লিটারে মাত্র ৭১ পয়সা। অন্যদিকে, বিদ্যুৎব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় তারা কৃষিবিদ্যুতের দামও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি করে রেখেছে। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে কৃষকদের সেচের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতে ২.৫ একর জমি পর্যন্ত বিনামূল্যে ও তার উপর ২০ পয়সা ইউনিট হিসাবে দাম নেওয়া হয়। কৃষিবিদ্যুতের দাম ইউনিট পিছু পাঞ্জাবে ২৫ পয়সা, হরিয়ানা, গুজরাট ও হিমাচলপ্রদেশে ৫০ পয়সা, মহারাষ্ট্রে ১১০ পয়সা, রাজস্থানে ৯০ পয়সা, কর্ণাটকে ৮০ পয়সা, দিল্লিতে ১২৫ পয়সা। কিন্তু সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গে এক ইউনিট কৃষিবিদ্যুতের দাম ৩৫০ পয়সা হিসাবে কৃষকদের থেকে আদায় করছে। সরকারের এই ভূমিকা কি কৃষকস্বার্থ রক্ষা করে?

কৃষকরা মরছে। কৃষক পরিবারগুলি একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে দ্রুতহারে। দিনমজুরি করে, নদী-সমুদ্রে বাগদা-মিন ধরে কোনওক্রমে বাঁচবার চেষ্টা করছে। গ্রামের খেতেও কাজ কতটুকু? কাজ না পেয়ে তারা শহরে ছুটছে কাজের সন্ধানে। আশ্রয় নিচ্ছে ফুটপাথে, বস্তিতে। সেখানেও কাজ নেই। ছুটছে ভিন্ রাজ্যে, এমনকী ভিন্ দেশেও। ভিন্ দেশে ও ভিন্ রাজ্যে কাজের সন্ধানে যাওয়া এই অসহায় মানুষগুলির মর্মান্তিক অবস্থার সংবাদ মাঝে মাঝে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে। পড়ে আঁতকে উঠছে মানুষ। বহু পরিবার বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে কাজের খোঁজে ভিন্ রাজ্যে ছুটছে। শিশুরাও তাদের সঙ্গে। স্কুলছুটের সংখ্যা আরও লাফিয়ে বাড়ছে। মিড-ডে মিলের লোভ দেখিয়েও শিশুদের স্কুলে রাখা যাচ্ছে না। অনেকে আবার শিশুদের পাঠিয়ে দিচ্ছে চায়ের দোকানে, মিষ্টির দোকানে, চামড়ার ব্যাগ তৈরির দোকানে কাজ করতে। শিশুশ্রম লুটে নিয়ে একদল মুনাফা লুটছে। পশ্চিমবাংলার কৃষকরা সুখে আছে! কৃষক-শিশুরাও সুখে আছে!

গ্রামের ভয়াবহ দারিদ্রের কারণে বাড়ির মেয়েরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সিপিএম সরকার নিয়োজিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা রিপোর্টও এই সত্য স্বীকার করেছে। নারীপাচারে, বিশেষত নাবালিকা পাচারে সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে। কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলার এই হচ্ছে ভয়াবহ চিত্র। কৃষকদের এই দুরবস্থার বিরুদ্ধে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষকজীবনের বিভিন্ন জরুরি দাবির সঙ্গে সেচের ক্ষেত্রে ৩ একর জমি পর্যন্ত বিনামূল্যে ও তার উপর ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি তুলেছে তারা। মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকদের পাম্প চালাবার জন্য সস্তায় ডিজেল সরবরাহেরও দাবি তারা জানিয়েছে।

কৃষকদের কার্যত আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া সরকারের কৃষকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না মানুষ — তা কি হয়? এমনিতেই তো তারা মরছে, ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তাহলে তারা কেন সোচ্চারে বলবে না — কৃষকঘাতী সরকার হয় বাঁচার দাবি মেনে নাও, নয়তো গুলি করে মারো? আগামী ৯ মার্চ সেই দাবি নিয়ে রাজধানী কলকাতার বুকে হাজির হচ্ছে গ্রামবাংলার লক্ষাধিক মানুষ। ওই দিন থেকে কলকাতায় লাগাতার অবস্থান করতে চলেছে তারা।

ডায়মন্ডহারবারে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র রাজ্য যুবশিবির

অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৫-২৭ জানুয়ারি রাজ্য যুব শিবির ডায়মন্ডহারবার হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙক্ষা, লড়াই-আন্দোলনকে গান, নাটক, আবৃত্তি, সঙ্গীত, মূকাভিনয় — শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্য, উন্নত রুচি সংস্কৃতির আধারে সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে গতিবেগ সঞ্চার করতে ও সঠিক যুবচেতনা গড়ে তুলতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক শত যুব প্রতিনিধি শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

শিবিরের প্রারম্ভিক কর্মসূচি হিসাবে ২৫ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবার স্টেট বাসস্ট্যান্ডে এক যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত ভাষণ দেন ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান পান্নালাল হালদার। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন ডায়মন্ডহারবার লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম মণ্ডল। সভায় দাবি ওঠে শিল্পায়ন, উন্নয়নের ধাপ্পা নয় — অবিলম্বে ৩ লক্ষ সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। মদের দাম নয়, জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে, পিটিটিআই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে।

ঐদিন সন্ধ্যায় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে যুবশিবিরের কাজ শুরু হয়। শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ দেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক। একাঙ্ক নাটক, মূকাভিনয়, সঙ্গীত, পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়। ২৬ জানুয়ারি সকালে সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে পাঁচ কিলোমিটার রোড রেস হয়। ভলিবল, কবাডি ও অন্যান্য খেলাধূলা হয়। বিকালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যুব প্রতিনিধিরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কর্মসূচিগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। শেষ দিনে সকাল থেকে নেতাজী স্টেডিয়ামে ফুটবল প্রতিযোগিতা চলে। সন্ধ্যায় শিবিরে সমাপ্তি ভাষণ দেন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও নাট্যকার নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমরেড সান্টু গুপ্ত। বিজয়ী প্রতিনিধিদের হাতে শিবিরের স্মারক তুলে দেওয়া হয়। যুবশিবির সফল করার জন্য সমস্ত পুরবাসী ও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন কমরেড সুরথ সরকার।

পুঁজিবাদী সঙ্কট বনাম সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি

মার্কিন অর্থনীতি ক্রমাগত গভীরতর সঙ্কটে নিমজ্জিত হচ্ছে। যারা ঋণ নিয়ে বাড়ি করেছিল, সময় মতো সেই ঋণ বা তার সুদ পরিশোধ করতে না পারার জন্য বাড়িগুলো বাজেয়াপ্ত করায় লক্ষ লক্ষ নাগরিক এখন গৃহহারা। কেবলমাত্র নিউইয়র্ক শহরেই পুঁজি লেনদেনের ব্যবসার সাথে যুক্ত ১০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। সঙ্কট যেভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছাঁটাই হবে।

চাকরির এই সঙ্কট সত্ত্বেও, অর্থ বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলো অবশ্য বহাল তবিয়তেই আছে। ২০০৬ সালে ওয়াল স্ট্রিটের পাঁচটি বৃহৎ সংস্থা তাদের শীর্ষ অফিসারদের ৪০ বিলিয়ন ডলার (৪ হাজার কোটি ডলার) বোনাস হিসাবে দিয়েছিল, যা আমেরিকার ৯ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মচারীর ২০০০-২০০৬ সালের অর্থাৎ ৬ বছরের মজুরি বৃদ্ধির দ্বিগুণ।

এই সঙ্কটের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সেই বৃহৎ ব্যাঙ্ক এবং বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে বাঁচাতে সরকার ৭০০ বিলিয়ন ডলার অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করেছে। আমেরিকার জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি ডলার এভাবে ওদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের দ্বারা পাশ হয়ে যায় ডেমোক্র্যাট কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামা এবং রিপাবলিকান শ্বেতাঙ্গ জন ম্যাকেইনের সমর্থনেই। এই বিপুল ডলার ব্যাঙ্কগুলো কিন্তু গৃহহারা, বিতাড়িত, উচ্ছেদ হওয়া মানুষ এবং ছাঁটাইয়ের মুখে পড়া শ্রমিকদের স্বার্থে খরচ করছে না।

যেমন শিকাগোর 'রিপাবলিক উইনডোজ অ্যান্ড ডোরস ফ্যাক্টরি'কে কোনও সাহায্যই দেওয়া হয়নি। এই সংস্থা ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা থেকে ঋণ নিয়ে চলত। কিন্তু দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকাকে মার্কিন সরকার ২৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিলেও ঐ ব্যাঙ্ক তার কোনও সুযোগ ঋণগ্রহীতা কারখানাগুলিকে দেয়নি, বরং ঋণ বন্ধ করে দিয়েছে। ঋণ না পাওয়ার দোহাই দিয়ে রিপাবলিক উইনডোজ তার ৩০০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দেয়, প্রয়োজনীয় ৬০ দিনের আগাম নোটিসটুকু পর্যন্ত না দিয়ে। লে-অফ করলে যে আর্থিক ভাতা দেওয়ার নিয়ম, সেটাও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দেয়নি। বেঁকে বসে শ্রমিকরা। মালিকরা যাতে কারখানার মালপত্র, যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলতে না পারে, সেজন্য তারা কারখানাটি ৬ দিন ধরে দখল করে রাখে। অবস্থা বেগতিক বুঝে শ্রমিকদের পাওনা মেটাবার জন্য ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা ও জে পি মর্গান ১.৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করে ঐ কারখানার জন্য।

কিন্তু দেউলিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের জন্য অন্য নিয়ম। যেমন, ওয়াশিংটন মিউচুয়ালের বড় অফিসার কেরি কিলিগান, ফেনি মা-এর ড্যানিয়েল মার্ট এবং ফ্রেডি মাক-এর রিচার্ড সাইরনের মতো ব্যক্তিরা বিদায়কালীন সুবিধা হিসাবে কোম্পানির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার পেয়েছে।

মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো ও অন্যান্য বৃহৎ সংস্থাগুলির স্বার্থে মার্কিন সরকার এখনও ইরাকে ও আফগানিস্তানে দখল কায়েম রাখতে প্রতি মাসে ১২০০ কোটি ডলার খরচ করে যাচ্ছে। এখন আবার গাড়ি শিল্পকে বাঁচাতে ১৭০০ কোটি ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার এবং এই প্যাকেজের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, গাড়ি শিল্পে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য পাওনাগণ্ডা কমাতে হবে। গাড়ি শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই এক নতুন চুক্তির ফরমানে পড়েছে যার ফলে নতুন শ্রমিকরা ঘণ্টায় মাত্র ১৪ ডলার মজুরি পাচ্ছে।

পুঁজিবাদই সমস্যা

কিছু দুর্নীতিবাজ কোম্পানি ম্যানেজারদের লক্ষ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বর্তমান সঙ্কট দেখা দেয়নি। তারা সংকটের সুযোগ নিয়ে লুঠছে। এর কারণ রয়েছে অনেক গভীরে। এই সঙ্কট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কট — যে ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী হয়, গরিব হয় আরও গরিব। এর মূলে আছে অতি উৎপাদনের সঙ্কট, যেখানে শ্রমজীবী জনগণ তাদের সীমিত আয় দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য কিনতে পারে, তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করে কোম্পানিগুলো। এই সঙ্কটের শুরু হয়েছে সাবপ্রাইম মর্টগেজের সমস্যা দিয়ে। নিম্ন আয়ের মানুষদের ঘরবাড়ির জন্য কম সুদে বন্ধকীর সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত আয় না বাড়ায় সাধারণ মানুষ এই সুদও যখন দিতে পারেনি, ব্যাঙ্কগুলো তখন বন্ধকীতে দেওয়া ঘরবাড়ি কেড়ে নিল। কিন্তু তাতে পাওনা সুদ ও আসল মিটল না, ফলে বন্ধকের ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোতে লালবাতি জ্বলল। এর ধাক্কা পড়ল বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিতে। কারণ, এরা ঐসব বন্ধকী কারবারিদের কোম্পানিগুলোয় প্রচুর অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করেছিল। এক কথায় এ হচ্ছে, সামাজিক উৎপাদন, যেখানে জনগণের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ঘরবাড়ি, খাদ্য, গাড়ি প্রভৃতি উৎপাদন করছে এবং সামাজিক উৎপাদনের দ্বারা তৈরি সম্পদের ব্যক্তিগত আত্মসাৎ (উৎপাদনে অর্থলগ্নিকারী একচেটিয়া সংস্থা ও বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা) -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ।

এভাবে ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে বাঁচাবার জন্য সরকারি নানা অনুদান দেওয়ার বিরুদ্ধতা করে যেতে হবে সকল শ্রমজীবী জনগণকে। তাদের দাবি তুলতে হবে — এই অর্থ ব্যবহার করা হোক গৃহহারাদের, সুদ দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের স্বার্থে, শ্রমিকদের পেনশন ফান্ড রক্ষায়, স্বাস্থ্যবীমায়, উন্নত মানের শিক্ষাদানে।

সমাজতন্ত্রই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান

এই সঙ্কটের সমাধান আখেরে সমাজতন্ত্রই। মার্কিন বৃহৎ কর্পোরেশন, তাদের প্রচারমাধ্যম এবং সরকার জনগণকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, সম্ভাব্য সব বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ, যা সমস্ত মানুষকে সুস্থ জীবন দিতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বছরে ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী প্রত্যক্ষ করছে 'মার্কিন স্বপ্ন' দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করলে আমরা আমাদের পিতামাতাদের থেকে ভাল করতে পারব — প্রকৃত মজুরি কমা শুরু হতেই এই ধারণা মিলিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের মতো সঙ্কটময় পরিস্থিতি এলেই কোনওরকম কাজ যোগাড় করাই অনেকের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নয়। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ার শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করেছিল। তারা বড় বড় কারখানা দখল করেছিল, জোতদারদের জমি কেড়ে নিয়েছিল, চাষিদের তা দিয়ে দিয়েছিল; সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দেশকে বের করে এনেছিল। ১৯৩০ সালে যখন গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়া মহামন্দায় ধুঁকছিল, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র তখন বেকার সমস্যা দূর করেছিল। উৎপাদনকে এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল যে, তা পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা দেওয়ার পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়েছিল। নতুন নতুন কারখানা সারা দেশেই, বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত, কম শিল্পোন্নত অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। **সারা বিশ্ব থেকে বহু শ্রমিক কাজের সন্ধানে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাড়ি দিয়েছিল। ১৯৩১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়, এবং এক লক্ষ মার্কিন নাগরিক চাকরির জন্য দরখাস্ত করে।** এত শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল না। এর মধ্যে ১৫ হাজার মার্কিন শ্রমিক সোভিয়েত ইউনিয়নে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান ঘরভাড়া এবং বন্ধকি ঋণ শোধ করতে যখন আমেরিকার জনগণের জীবন জেরবার, সারা আমেরিকায় কয়েক লক্ষ নাগরিকের বাস্তবে থাকার কোনও ঘরই নেই, তখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে বাড়িভাড়া পারিবারিক আয়ের ৫ শতাংশের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার ৪ কোটি ৭০ লক্ষ নাগরিকের স্বাস্থ্যবীমা নেই এবং বাদবাকি জনগণের অধিকাংশেরই চিকিৎসার জন্য উচ্চহারে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হয় ও মাইনে থেকে কাটাতে হয়। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সকল নাগরিককে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিনা পয়সায় উন্নত মানের চিকিৎসা দিত। আমেরিকায় গণশিক্ষা ব্যবস্থা সর্বদা বাজেট ঘাটতিতে ভুগছে এবং শ্রমজীবী জনগণের সকল শিশুকে আমেরিকা ভাল শিক্ষা দানেও অক্ষম। কিছু বড় শহর এবং রাজ্য যেখানে সরকারি কলেজ আছে, তারা ক্রমাগত টিউশন ফি বাড়াচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কিন্তু নার্সারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক, উন্নত মানের শিক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

নির্বাচনে এই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও আমেরিকায় জাতিবিদ্বেষ এবং পুলিশি বর্বরতা চলছে। রাশিয়ায় জারের আমলে অ-রুশিয় জনগণের বিরুদ্ধে যে জাতিগত বৈষম্য করা হত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে তা অতি দ্রুত কমিয়ে আনা হয়েছিল। প্রখ্যাত আফ্রো-আমেরিকান লেখক ল্যাঙ্কস্টন হিউজেস ১৯৩০ সালে বেশ কয়েক মাস সোভিয়েট সেন্ট্রাল এশিয়ায় ছিলেন। তিনি তাঁর 'আমি যত ঘুরছি তত বিস্মিত হচ্ছি' নামের বইয়ে লিখেছেন, এই অঞ্চলে অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি সমদৃষ্টি, সমব্যবহার তিনি লক্ষ করেছেন। নাগরিক তথা মানবাধিকারের স্বার্থে মহান যোদ্ধা পল রবসনও সোভিয়েট ইউনিয়নে জাতিবিদ্বেষের অনুপস্থিতির কথা লিখেছেন, যেটা তিনি আমেরিকায় পাননি।

ফলে, আজ আমেরিকা তো বটেই, অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও উৎপাদন ক্ষমতার যে বিপুল বিকাশ ঘটেছে, তাতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলে শ্রমজীবী জনগণের জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা অনায়াসে সম্ভব। কিন্তু সেটা করতে হলে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে, পুঁজিপতিদের সম্পত্তি সামাজিক মালিকানায় নিতে হবে। এ পথে অবশ্যই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার সকল শক্তি নিয়ে বাধা দেবে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বহু কাল আগেই বলেছে — ''আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ বাস্তবে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর সাধারণ বিষয়কর্ম দেখভাল করার একটি কমিটি ব্যতীত কিছু নয়''। সমাজব্যবস্থায় এই বদল আনতে পারে কেবলমাত্র সচেতন এবং যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীই।

বিষ্ণুপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে বাখরাহাট স্কুল মোড়ে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড বাসুদেব কাবড়ী। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি অপূর্ব পাল, এস ইউ সি আই-এর কমরেডস তাম্রধ্বজ আদক, সুজিত পাত্র। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দেবব্রত ঘোষ।

কৃষ্ণা টিস্যু কারখানা

দূষণের বিরুদ্ধে বাসিন্দারা আন্দোলনের পথে

হাওড়া জেলার বাগনান ব্লকের প্রায় ১৫টি গ্রামের ২০ হাজার মানুষের জীবন জীবিকা কৃষ্ণা টিস্যু প্রাইভেট লিমিটেডের (পেপার মিল) দূষণে জেরবার। সম্প্রতি ভুক্তভোগী এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ এক সভায় মিলিত হয়ে গঠন করেছেন — 'কৃষ্ণা টিস্যু দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'। ৮ জানুয়ারি ঘোড়াঘাটা স্টেশন বাজারে কমিটির প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জানুয়ারি বাগনান ২নং বিডিও-র কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে বিভিন্ন গ্রামের ছয় শতাধিক চাষি ও ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। বিশেষত দূষণের কবলে আক্রান্ত কাঁটাপুকুর হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ওই দিন বিডিও-র নির্দেশে দূষণ পর্যদের প্রতিনিধি এবং কারখানার মালিক পক্ষও উপস্থিত থাকেন। কৃষ্ণা টিস্যু দূষণ প্রতিরোধ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা প্রাক্তন অধ্যাপক আশুতোষ সামন্ত, কমিটির সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদক সহ বিভিন্ন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিডিও সিদ্ধান্ত নেন যে, অবিলম্বে 'দূষণ পর্যদ' নির্দেশিত দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কারখানা চলানো চলবে না। কিন্তু এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে মালিকপক্ষ কারখানা চালু রেখে দূষণ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বাকুড়দহ, কামারদহ, কাঁটাপুকুর, নবাসন, পিপুল্যান, মাদারী, হেলেদীপ, ভুলগেড়িয়া, ঘোড়াঘাটা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গঠিত হয়েছে — দূষণ প্রতিরোধ কমিটির গ্রাম শাখা। কমিটির দাবি, কারখানা হোক, কিন্তু কোনও মতেই হাজার হাজার মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও চাষাবাদের ক্ষতি করে নয়।

ঘোড়াঘাটা দেউলটি রেললাইন সংলগ্ন মাদারী-বরুণদা মৌজার প্রায় ৫০ একর জমিতে গত ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে চালু হয় ঐ পেপার মিল। মিল চালু হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার অধিবাসী কাজ পাওয়ার আশায় থাকলেও বছর খানেকের মধ্যেই কারখানার বর্জ্য, জল, ধোঁয়া ইত্যাদির ভয়াবহ দূষণের ফলে বাসিন্দাদের জীবন অতিষ্ঠ। পানীয় জল পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে নানা অসুখ। দূষণের শিকার হচ্ছে নবাসন হাইস্কুল ও কাঁটাপুকুর হাইস্কুলের কচিকাঁচারাও। যাতায়াতের পথে ট্রেনযাত্রীরাও ঐ বীভৎস গ্যাসের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছেন।

হাওড়া জেলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শ্রীমন্ত ধাড়া বলেন, সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির অন্যতম অর্থকরী ফসল পদ্ম, গোলাপ, দোপাটি, গাঁদা, অপরাজিতা, জবা, চেরি, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলের চাষ নষ্ট হতে বসেছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আমাদের সমিতিও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

বেইরুট সম্মেলনে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড প্রচণ্ড'র বার্তা

গত ১৬-১৮ জানুয়ারি বেইরুটে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান কমরেড প্রচণ্ড নিম্নলিখিত বার্তাটি 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপল্স্ সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি'র সভাপতি র‍্যামসে ক্লার্কের উদ্দেশে পাঠান ঃ

প্রিয় কমরেডস,

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে সংগ্রামরত বিভিন্ন নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার ও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আপনাদের উদ্যোগকে আমাদের দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)-র পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ২০০৭ সালে যে কনফারেন্সে এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটি (আই এ পি এস সি সি) গঠিত হয়েছিল, আমাদের দলের একজন কমরেডও সেখানে প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সম্মেলন ছিল এক বিরাট পদক্ষেপ। আমরা আরও একবার অঙ্গীকার করছি, এই উদ্যোগকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেব এবং আমাদের যথাসাধ্য ভূমিকাও পালন করব।

আমরা দল হিসাবে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছি, যখন আই এ পি এস সি সির সাধারণ সম্পাদক, কমরেড মানিক মুখার্জী নিজে নেপালে এসে আমাকে চিঠি দিয়ে ১৬-১৮ জানুয়ারি বেইরুটের দ্বিতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। আমার দল এবং আমি নিজেও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। যাই হোক, সরকার এবং দল — দু'য়ের কাজের চাপ সামাল দিতে গিয়ে আমার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না। এই অপারগতার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আজকের বিশ্বপরিস্থিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল — সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং বিভিন্ন নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বৃদ্ধি। তার উপর সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট, যার থেকে এমনকী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিরও রেহাই মেলেনি, পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর ফলে নিশ্চিতভাবেই নিপীড়িত দেশগুলির জন্য বরাদ্দ আর্থিক সহায়তা ছাঁটাই করা হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে তাদের উপর শোষণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে। এর পরিণামে সাম্রাজ্যবাদ এবং নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব বর্তমান বিশ্বের মূল দ্বন্দ্ব, তা আরও তীব্র হবে। এছাড়াও এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে আগামী দিনে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরেও শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বও নিশ্চিত ভাবেই তীব্রতর হবে। এ সব কিছুই ইঙ্গিত দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লব এবং গণপ্রতিরোধের এক নতুন তরঙ্গ বিশ্বজুড়েই সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

কিন্তু এই অনুকূল পরিস্থিতিকে সর্বহারা বিপ্লব ও গণপ্রতিরোধ সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শগত ও সাংগঠনিক শক্তি (সাবজেকটিভ স্ট্রেংথ) আজ অত্যন্ত দুর্বল। তার উপর, আমাদের নিজেদের মধ্যেও আদর্শগত ও রাজনৈতিক উপলব্ধির মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য, যা আন্তর্জাতিক সর্বহারা ঐক্য গড়ে তোলার পথে ব্যারিকেড হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এই দুর্বলতায় শত্রুরা খুশি।

এই বিদ্যমান বাস্তব এবং আদর্শগত ও সাংগঠনিক (সাবজেকটিভ অ্যান্ড অবজেকটিভ সিচুয়েশন) পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে আই এ পি এস সি সি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আই এ পি এস সি সি-র এই দ্বিতীয় সম্মেলন যে সেই লক্ষ্যে আরও বহু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন, ব্যক্তি ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে এবং এই মঞ্চে যুক্ত করে তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল করতে সফল হবে, সেই বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব জুড়ে তার জাল ছড়িয়ে দিয়েছে, তখন একমাত্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলি ও জনগণের ঐক্যই সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন এবং যুদ্ধকে কার্যকরী ভাবে প্রতিহত করতে পারে। অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব শেষ পর্যন্ত বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই। একমাত্র তখনই সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধের হাত থেকে বিশ্বের জনগণের প্রকৃত মুক্তি আসা সম্ভব।

প্রিয় কমরেডস, আপনারা জানেন যে নেপালের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। প্রায় ২৪০ বছরের প্রাচীন রাজতন্ত্রকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে টানা দশ বছরের মহান গণযুদ্ধ এবং ২০০৬ এপ্রিল মাসের ১৯ দিনের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সংবিধান পরিষদ এখন নেপালকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেছে। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ রাজশক্তি বিদায় নিয়েছে এদেশ থেকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালের জনগণের সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। সামনের দিনগুলিতে যথেষ্ট কঠিন সংগ্রাম তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

আজকের পরিস্থিতিতে যখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের ঘটনা দুনিয়া জুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, নেপালের ক্ষেত্রে যেটা প্রধানত আসছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দিক থেকে, তখন নেপালের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তার সাফল্যের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমর্থন ও সংহতির উপর বেশি নির্ভরশীল থেকেছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভবই হত না, যদি সংগ্রামী নেপালী জনগণ বাইরের শক্তিশালী সমর্থন না পেত। এবং এ কথা সামনের দিনগুলির লড়াইয়ের জন্যও কঠিন ভাবে সত্য। আই এ পি এস সি সি-র বেইরুট সম্মেলন প্রসঙ্গেও আমরা বলতে চাই যে, আমরা দৃঢ় ভাবে মনে করি, এই সম্মেলন নেপালী জনগণকে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করবে এবং এইভাবে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে নেপালে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং দেশ থেকে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শেষ চিহ্ন চিরতরে মুছে ফেলতে সাহায্য করবে।

প্রিয় কমরেডস্, আই এ পি এস সি সি-র এই দ্বিতীয় সম্মেলনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত না থাকতে পারার কারণে আমি আবার ক্ষমা চাইছি। তবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে আমরা আপনাদের সাথে আছি। ১৬-১৮ জানুয়ারি, ২০০৯ লেবাননের বেইরুটে আই এ পি এস সি সি এই দ্বিতীয় সম্মেলনের আমরা সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এ শুধু 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর উপর আক্রমণ নয়, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ

প্রভাস ঘোষ

দারিদ্রজনিত অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কিশোরীদের কীভাবে দেহব্যবসায় যোগ দিতে বাধ্য করছে নারীপাচার চক্র, সে বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করে সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার বর্ধমান জেলার এক সাংবাদিকের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এরপরই অসীমা খাতুন নামে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে, যা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। কিন্তু এরই সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন পত্রিকার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিথ্যা প্রচারে নেমে পড়ে সিপিএম।

মেয়েটির দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য ঐ সাংবাদিককে দায়ী করা হয়। এবং বিস্ময়করভাবে পুলিশ, এফ আই আর-এ নাম না থাকা সত্ত্বেও ওই সাংবাদিক প্রবীর চট্টোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করেছে, অথচ অভিযুক্ত হিসাবে যে দু'জনের নাম এফ আই আর-এ আছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি।

এই অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জেলার সাংবাদিকরা ৩ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। ৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রতিদিন পত্রিকার কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের একটি প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। পত্রিকা দপ্তরের সামনে থেকে বের হয়ে মিছিল মেট্রো চ্যানেলে যায়। সেখানে এক সভায় কবি সাহিত্যিক চলচ্চিত্র শিল্পী ও পরিচালক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এস ইউ সি আই দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সেখানে বলেন, এই সভার উদ্দেশ্য আপনারা সকলেই জানেন। আমি শুরুতে একজন প্রখ্যাত লেখকের একটি বক্তব্য পড়ে শোনাচ্ছি, যার নাম আপনাদের বুকে, আপনাদের বাবা-মায়েদের বুকে আছে। তিনি লিখেছেন, "আজ এই দুর্ভাগা দেশে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই — তাহা সিডিশান। অথচ দেখিতে পাই, বড় লাট হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন — সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা — এমনকি তীব্র ও কঠোর হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই, যাহাতে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয় —এমনি। অর্থাৎ, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এমনটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ।"

১৯২২ সালে শরৎচন্দ্র এ কথা বলেছিলেন। সেটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকাল। কিন্তু সেই পরিস্থিতির কি আজ আমাদের দেশে পরিবর্তন হয়েছে? একজন সাংবাদিকের উপর শুধু আক্রমণ হয়েছে, এ কথা আমি মনে করি না। এ ঘটনায় শুধু সংবাদপত্রের উপর, এমনকী শুধু সংবাদমাধ্যমের উপর আক্রমণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। এই আক্রমণ গণতন্ত্রের উপর, প্রতিবাদী কণ্ঠের উপর, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারের উপর।

আজকের প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। লেখা হয়েছে — "কোনও পত্রিকার মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যদি কোনও পার্থক্য থাকে, তবে সুস্থ বিতর্কের মধ্য দিয়েই তার নিরসন হতে পারে, অন্য কোনও অসৎ উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, শাসক দল ঠিক সেই পথই অবলম্বন করল, যা কখনও কোনও মার্কসবাদে বিশ্বাসী দলের কাছে আশা করা যায় না।" যিনিই লিখুন, তিনি মার্কসবাদকে আক্রমণ করেননি, যেটা সিপিএমকে দেখে আজকাল অনেকেই করে থাকেন। আমরা বারবার বলেছি, সিপিএম কোনও দিনই মার্কসবাদী দল ছিল না, আজও নেই।

একটা ঘটনা বলি। ১৯৬৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি আপত্তিকর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে আমাদের ছাত্র-যুব কর্মীরা পত্রিকা দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, কেউ কেউ ঢিল মেরেছিল। আমাদের মহান শিক্ষক, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ তখন জীবিত। তিনি এই ঘটনা শুনে ছাত্রকর্মীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। আমি তখন ছাত্র ফ্রন্টের দায়িত্বে ছিলাম, আমাকেও বকেছিলেন — 'এরকম মানুষ করছ?' আপনারা জানেন, মিথ্যা মামলায় আমাদের দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যে ঘটনা নিয়ে এই মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছিল, সে সম্পর্কে বেনামে সিপিএমের দৈনিক পত্রিকা লিখেছিল — আমরা নাকি কোলের শিশুকে খুন করে সেই রক্তমাখা ভাত তার মা-কে খাইয়েছি। পরে আরেকটি ঘটনায় আবার ঐ দৈনিক পত্রিকাই লিখেছিল, আমাদের ছাত্রকর্মীরা নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ভারতী রায়ের কাপড় খুলে দিয়েছিল। আমরা হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে জনগণকে আমাদের বক্তব্য জানাই। সম্প্রতি বিধান চ্যাটার্জীর চিঠি নিয়েও অনেক কিছু হয়েছে। আমি শুধু সাংবাদিকদের বলেছিলাম, আপনাদের ঘরে বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রীরা এসব বিশ্বাস করেন কি? এছাড়া আর কিছু বলিনি। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সংবাদ প্রতিদিনের সহযোগী সম্পাদক কুণাল ঘোষের কথা। তিনি আমাদের রাজনীতির লোক নন। তিনি তখন দিল্লিতে ছিলেন, আমায় ফোন করে বললেন, 'প্রভাসবাবু বিচলিত হবেন না, প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবেই।' আমি বলেছিলাম, আমরা বিচলিত নই, জনগণ আমাদের পাশে আছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএম যেভাবে রক্ত ঝরিয়েছে, খুন করিয়েছে, নারী ধর্ষণ করিয়েছে, সেটা এ দেশের দুটি প্রধান বুর্জোয়া দল কংগ্রেস-বিজেপি, যাদের সাথে আমাদের মৌলিক ও তীব্র মতপার্থক্য আছে, তারাও করেনি। গুলি চালিয়ে মানুষ খুন তারাও করেছে, কিন্তু গণআন্দোলন ভাঙতে নারীধর্ষণ করায়নি। সিপিএমের এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণ দেখেই আমরা গণআন্দোলনের স্বার্থে তৃণমূলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমি বলেছি, অ্যান অনেস্ট গান্ধাইট ইজ বেটার দ্যান এ ডিগ্রেডেড সো-কল্ড কমিউনিস্ট (একজন অধঃপতিত তথাকথিত কমিউনিস্টের চেয়ে একজন সৎ গান্ধীবাদী ভাল)। আপনারা লড়াই করে যান, আমরা পাশে আছি।

নিহতদের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের শপথ নিল লালগড়ের মানুষ

২৫ জানুয়ারি মুখে কালো কাপড় বাঁধা কয়েকজন দুষ্কৃতী লালগড় আন্দোলনের অন্যতম নেতা বেলপাহাড়ীর নির্মল সর্দারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে এবং ২ ফেব্রুয়ারি রামগড়ের খাসজঙ্গল গ্রামে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সিপিএম-এর হার্মাদবাহিনী ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে ৩ জনকে হত্যা ও অসংখ্য মানুষকে গুলিবিদ্ধ করে। এই ঘটনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, লালগড় আন্দোলনকে এবার নৃশংসভাবে দমন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিপিএম এবং রাজ্য সরকার।

ঘটনা পরম্পরায় একটা সুনির্দিষ্ট ছকপ্রকট হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি ছিল পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে বেলপাহাড়ীর চাকাডোবায় পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটির এক বিশাল জনসভার দিন। ঠিক ঐদিন ভোরেই ঐ জনসভার উদ্যোক্তাদের দুজনকে তুলে নিয়ে যায় সিপিএম দুষ্কৃতীরা। তারা নির্মল সর্দারকে খুন করে, হিমাদ্রী মাহাতো কোনও প্রকারে প্রাণে বেঁচে যায়। পরের ঘটনা আরও নিখুঁত পরিকল্পনার ফল। ৩ ফেব্রুয়ারি লালগড় থানার রামগড়ে ঐ কমিটি জনসভা আহ্বান করে। তার প্রস্তুতি হিসাবে গ্রামে গ্রামে মিটিং চলছিল। ২ ফেব্রুয়ারি বিকালে রামগড়ের পার্শ্ববর্তী খাসজঙ্গল গ্রামে কমিটির সম্পাদক সিদু সরেনের উপস্থিতিতে গ্রামসভা চলছিল। আচমকা সি পি এম-বন্দুকবাহিনী এবং পুলিশ টাটা সুমো করে এসে নির্বিচারে গুলি চালায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেকে লুটিয়ে পড়ে। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে মুহূর্তে গ্রামবাসী নারীপুরুষ হাজারে হাজারে এই জল্লাদবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পুলিশ ও হার্মাদরা গুলি করতে করতে পিছু হটে। ঘটনাস্থলেই গুলিতে রাজারাম মান্ডি এবং তার পুত্র লখিন্দর মান্ডি মারা যান। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে গুলিতে আহত গোপীনাথ সরেন রাত্রে মারা যান। মেদিনীপুর হাসপাতালে এখনও ২ জন এবং লালগড় হাসপাতালে ৩ জন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার এই ছক তৈরি করা হয়েছে। সেজন্য সিপিএমের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে মাত্র ১ দিন আগে ঐ রামগড়েই পার্শ্ববর্তী মুড়ারপুর গ্রামের নন্দদুলাল পালকে তারাই খুন করে। এই ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য খুন রাজ্যের নানা স্থানে ইদানীং ঘটেই চলেছে এটা সকলেরই জানা। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য সিপিএম বন্‌ধও ডেকে দেয়। লালগড়ে নন্দলালের খুন নিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি তারা বন্‌ধ ডেকেছিল। এই বন্‌ধের মধ্যেই খাসজঙ্গল গ্রামে তারা গুলি চালায়। পুলিশ জনরোষ থেকে সিপিএম হার্মাদদের রক্ষা করে, যাতে তারা নিরাপদে পালিয়ে আসতে পারে। বন্‌ধ এর জন্য গাড়িঘোড়া না চলাটা তারা এইভাবে কাজে লাগায়। অপরদিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য গ্রামবাসীরা কোনও গাড়ি জোগাড় করতে না পারায় চোখের সামনে আহতরা রক্তক্ষরণের ফলে একের পর এক মারা যায়। সম্পাদক সিদু সরেন উপস্থিত সাংবাদিকদের কাকুতি মিনতি করে কোনও প্রকারে একটা গাড়িতে কয়েক জনের প্রাণ বাঁচান। সময়ে চিকিৎসা পেলে গোপীনাথের প্রাণ হয়ত বাঁচানো যেত। হার্মাদবাহিনীর পরিকল্পনা যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, তার প্রমাণ রাখল সিপিএম। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নন্দদুলালের মৃতদেহ হার্মাদরা তাদের সঙ্গে গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল এবং মুহূর্তে সংবাদমাধ্যমে তাদের তৈরি করা বয়ান প্রচার করে দেয় যে, সিপিএমের শোক মিছিলে জনসাধারণের কমিটি আক্রমণ করেছে। এভাবে তারা গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যা প্রচার করতে থাকে।

এ কথা সকলেই জানেন যে, পুলিশ ও সিপিএমের অত্যাচারে দীর্ঘকাল নির্যাতিত এবং চিরকালের বঞ্চিত জঙ্গলমহলের শোষিত মানুষের গত ৫ নভেম্বর লালগড়ের নৃশংস ঘটনায় সকল ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারপর থেকে তারা এক ঐতিহাসিক গণআন্দোলন চালিয়ে এসেছে। এটাও লক্ষণীয় যে, বিরাট এলাকায় তিনমাস ধরে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে এই আন্দোলনে কোনও সরকারি দপ্তর কিংবা পুলিশ-প্রশাসনের একজনেরও গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। অথচ আন্দোলনের বলিষ্ঠতার চাপে জেলা ও রাজ্য প্রশাসন নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, জনসাধারণ নিজেরাই কমিটি করে এই আন্দোলন চালিয়েছে। ইতিপূর্বেও সিপিএম হার্মাদ নামিয়েছে, রাজ্য সরকার নানা কৌশলে এই ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিকে দমিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু বারে বারে পিছু হটে অবশেষে তারা এই রক্তপাত ও হত্যালীলায় নেমেছে। আর দিনকে রাত করার জন্য হত্যা ও গুলি চালাবার দায় উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। এমনকী পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশের ডিএসপি (এডিএম) নিজে গিয়ে মেদিনীপুর হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ বাসন্তী হাঁসদা এবং রমেশ মুর্মুকে হুমকি দিয়ে লিখে দিতে চাপ দিয়েছে যে — তারা নিজেরাই নিজেদের গুলিতে আহত হয়েছে। ডিএসপি যখন এই হুমকি দিচ্ছে তখন বাসন্তীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রক্ত দেওয়া চলছে। সেই অবস্থাতেও ক্ষীণকণ্ঠে বাসন্তী ও রমেশ প্রতিবাদ করে বলেছে — পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সিপিএম-এর লোকরাই গুলি চালিয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী ৪ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বামফ্রন্টের মিটিংয়ে বলেছেন — 'কারা গুলি চালিয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ তখনও পর্যন্ত মৃতদেহগুলি কেউ দাবি করেনি।' অথচ ৩ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর হাসপাতাল থেকে তিনজনের মৃতদেহ নিয়ে গ্রামে যায় তাদের আত্মীয়রা। স্বরাষ্ট্রসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী বলেছেন কারা গুলি করল তা বোঝা যাচ্ছে না। অথচ তাঁর দপ্তরের পুলিশের সম্মুখেই সিপিএম বাহিনী গুলি চালানোর পর পুলিশ খুনীদের রক্ষা করল জনরোষ থেকে। অর্থাৎ গোটা প্রাশাসন একযোগে নেমেছে এই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী লালগড় আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে।

কিন্তু এত করেও লালগড় আন্দোলন দমানো যায়নি। খাসজঙ্গলে যেখানে গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল রাজারাম, লখিন্দর আর গোপীনাথ, ঠিক সেখানেই হাজার হাজার গ্রামবাসী তিনটি চিতা জ্বালিয়ে উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়ভাবে শপথ নিয়েছে — এই হত্যার জবাব আমরা দেবই দেব, বীর শহীদগণ তোমরা একথা জেনে যাও। আমরা সেজন্য তৈরি।

লালগড় ঃ ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য কিনা বিচার করুক ট্রাইবুনাল

একের পাতার পর

অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে, মাওবাদী তকমা লাগিয়ে, যাদের না দেওয়া হচ্ছে জামিন, না হচ্ছে বিচার। সেজন্য আমাদের পার্টির তরফে দাবি তুলেছি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে ট্রাইবুনাল গঠন করে তাদের মামলাগুলি সেখানে হাজির করা হোক। ট্রাইবুনাল ঠিক করুক, কী ঘটেছে, আর কী ঘটেনি।

২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে বনাধিকার স্বীকৃতি আইন করেছে, তাতে জঙ্গলের অধিবাসীদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটা কার্যকর করেনি। সেটা কার্যকর করলে জঙ্গলের অধিবাসীরা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেত। জঙ্গলের অধিবাসীরা জঙ্গল থেকে যা সংগ্রহ করে — পাতা, কাঠ, ঘাস, সেগুলো সবই দালালরা নিয়ে যায়। আন্দোলনকারীরা বলছে, সরকার এগুলো আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য দামে সরাসরি কিনে নিক। আপনারা জানেন কিনা জানি না, জঙ্গলে গাছের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত বনরক্ষা কমিটি। অথচ কয়েক বছর অন্তর যখন গাছ কাটা হয়, সেগুলি ফরেস্ট অফিসাররা দালালদের বিক্রি করে। লক্ষ লক্ষ টাকা এদিক-ওদিক হয়ে যায়। কমিটির সদস্যদের দেওয়া হয় নামমাত্র। অথচ ওরাই জঙ্গলকে রক্ষা করে। তাই তাদের দাবি, কাঠ বিক্রির টাকার অর্ধেক দিতে হবে বনরক্ষা কমিটিকে, বাকি অর্ধেক নেবে সরকার।

আদিবাসীদের ট্রাইবাল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না। অথচ বলা হচ্ছে, ১৯৫০ সালের দলিল দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে, তারা যে জমিতে থাকে, সেই জমির তারা মালিক। বেশিরভাগেরই সেই দলিল নেই। অনেকের তো কোনও জমিই নেই। আর একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু বিদ্যালয় ও একলব্য বিদ্যালয় নামে পরিচিত বিদ্যালয়গুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার থেকে টাকা আসে। কিন্তু সে টাকা বিদ্যালয় পায় না, ছাত্ররাও পায় না। আদিবাসী ছাত্ররা তাদের প্রাপ্য স্টাইপেন্ড পায় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই বললেই চলে। যেগুলো আছে তাতে ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নেই, ভাঙাচোরা। গোটা এলাকায় পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সেচ কিছুই নেই। এমনিতেই ওখানে জল থাকে না। সেচ হলে কিছু চাষ হতে পারত। তারও কোনও পরিকল্পনা নেই। সমস্যা অনেক গভীরে। সিপিএম নেতাদের ভাব হচ্ছে, ওরা জঙ্গলের লোক তো, ফলে ওদের কিছুরই দরকার নেই। মধ্যযুগীয় রাজত্ব বলতে যা বোঝায়, সেটাই চলছে ওখানে।

লালগড়ে তো সিপিএমেরই একচেটিয়া ভোট ছিল। এখন ওরা সেখানে মাওবাদীদের আবিষ্কার করছে। মাওবাদীরা ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাস করে। আমরা সে রাজনীতি সমর্থন করি না এবং সেটা মাওবাদও নয়। মাও সে তুঙ কোথাও ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি করেননি। ওদের মুষ্টিমেয় লোক আছে ওখানে। আমরাও দাবি করি না, এই আন্দোলন আমরা করেছি। সিঙ্গুরে আমরা আন্দোলন করেছি, নন্দীগ্রামে করেছি। লালগড়ের গণবিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত। বহুদিনের পুঞ্জীভুত বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। ভারতের ইতিহাসে এটাই প্রথম যেখানে জনগণ নিজেরাই লড়াইয়ের কমিটি গড়ে তুলেছে — যে জনগণের কমিটি গড়ে তোলার কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। এই কমিটি আমরা করিনি, তারা নিজেরাই করেছে। তাদের নেতারা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন তারা নিজেরা কমিটি করে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এটা সাধারণ মানুষের লড়াই। যেমন জনগণের কমিটি ৪৮ ঘণ্টা বনধ্ ডেকেছে। আমরা তা সমর্থন করিনি। আমরা ওদের নেতাদের বলেছি, আপনারা ভুল করছেন; এখনই বনধ্ এতদূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা তাদের আন্দোলনের পাশে আছি।

আদিবাসী জনগণ হচ্ছে ভারতে সবচেয়ে শোষিত অংশ। এ দেশ ছিল একদিন তাদেরই দেশ। আর্যরা পরে এসে তাদের বন-জঙ্গলে তাড়িয়েছে। ওরা আমাদের বলে দিকু, মানে বিদেশি। তারা যাদের 'দিকু' মনে করে, পশ্চিমবাংলার পাঁচটা জেলার সেই মানুষ কিন্তু তাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। সিদু-কানহুর বিদ্রোহের মধ্যেও গরিব মানুষ ছিল, বিরসা মুন্ডার বিদ্রোহের মধ্যেও গরিব মানুষ ছিল, শুধু আদিবাসীরাই ছিল না। বর্তমান গণআন্দোলনেও আদিবাসীদের সাথে অন্যান্য গরিব মানুষ আছে। গতবার আমরাই ওদের আন্দোলনের সমর্থনে প্রথম বনধ্ ডেকেছিলাম, এবারও ডেকেছি। আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব।

বনধ্ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট

তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। সুপ্রিম কোর্ট বন্‌ধকে বলেছে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত। ইতিপূর্বে বন্‌ধ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। আমরাই একমাত্র পার্টি, যারা কোর্টে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। আমাদের কোনও উকিল ছিল না।

কংগ্রেস-সিপিএম আঁতাত

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএম পরস্পর গভীর বোঝাপড়া করেই চলছে। এটা আমরা আগাগোড়াই বলে এসেছি। মাঝখানে সিপিএম যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে, সেটাও বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই। কারণ কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করে পার্লামেন্ট নির্বাচনে পশ্চিমবাংলা, কেরালা, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট চাওয়া যায় না। ফলে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই এই সাময়িক সমর্থন প্রত্যাহার। এখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার কোনও বিষয়ই নেই। মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত যে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরাষ্ট্র ইজরায়েল দীর্ঘকাল ধরে আরব ভূখণ্ডে আক্রমণ চালাচ্ছে, প্যালেস্তিনীয়দের গণহত্যা করছে, সেই ইজরায়েল সরকারের আমন্ত্রণে সিপিএমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে সফর করতে গিয়েছিলেন। যে ম্যাকনামারা একদিন কলকাতায় নামতে পারেনি, তার বংশধরেরা আজ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ঘুরে বেড়ায়। এখানে কলাইকুন্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়া বিনা বাধায় হয়ে গেল। এ সব ঘটনা সকলেই জানেন। এগুলো কি সিপিএমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নমুনা?

প্রণব মুখার্জী এখানে সিপিএমকে তুষ্ট করার জন্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে আক্রমণ করে গেলেন। বক্তৃতা করে গেলেন, সিপিএম নাকি রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিরাট উন্নতি করেছে। এখন তারা নয়াচর প্রকল্পকে স্যাংশন দিচ্ছে কেন? গভীর বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই এটা করা হচ্ছে। আজ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং বলেছেন, সিপিএমের সঙ্গে তাঁদের সখ্যতা অটুট রয়েছে। আমরা চাই না বিজেপি ক্ষমতায় আসুক। কিন্তু কংগ্রেস-সিপিএমের এই দুষ্ট রাজনীতির মধ্যে ভোট ছাড়া, গদি ছাড়া জনস্বার্থ বলে কিছু নেই। আমরা এইসব গদির রাজনীতির মধ্যে নেই।

রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আমার বক্তব্য, আজকের কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। সোনিয়া গান্ধী কোন ক্ষমতার জোরে ভারতকে শাসন করছেন, একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ — এই পরিচয় ছাড়া? এখন আবার তাঁর ছেলেকেও ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতের মতো একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ কি এ জিনিস মেনে নিতে পারে? এই পরিবারতন্ত্র তো প্রায় রাজতন্ত্রের মতো চলছে। সৎ কংগ্রেস কর্মীদের জিজ্ঞেস করা দরকার যে তাঁরা কি দেশে এ জিনিসই চান? কংগ্রেস কর্মীদের উচিত নেতাদের বলা যে, ভোট চাওয়ার আগে কংগ্রেস নেতৃত্বকে ঘোষণা করতে হবে, নির্বাচনের পরে তারা সিপিএমের সাহায্যে সরকার গড়বে না। যে সিপিএম এ রাজ্যে ফ্যাসিবাদী অত্যাচার চালাচ্ছে, এত খুন ও নারী ধর্ষণ করিয়েছে, কংগ্রেস ঘোষণা করুক তার সমর্থন সে নেবে না। কংগ্রেস কর্মীদের যদি এতটুকু সততা থাকে, তা হলে তাদের এ প্রশ্ন তোলা উচিত। আমি সৎ কংগ্রেস কর্মীদের বলছি, আমাদের দলের রাজনীতি তো তাঁরা করবেন না, তাই সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়তে হলে বরং তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিন। রামমোহন

সাতের পাতায় দেখুন

ন্যায্য দাম ও ক্ষতিপূরণের দাবি উঠল আলুচাষি সম্মেলনে

সিঙ্গুরে ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন

গণআন্দোলনের ইতিহাসে যে জায়গাটির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে সেই সিঙ্গুরে ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে চারশোরও কিছু বেশি আলুচাষি সম্মেলনে যোগ দিতে সিঙ্গুর ক্লাব হলে উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন কমিটির রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সমিতির রাজ্য সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান ও সভাপতি শেখ খোদাবক্স সহ কৃষক আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রোদে পুড়ে জলে ভিজে অমানুষিক পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েও আলুচাষিরা আজ সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে। দীর্ঘ দিন ধরেই চাষের খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। অথচ ফসল ওঠার পর আলুর দাম পায় না চাষি। ঋণের জালে জড়িয়ে ইতিমধ্যেই এ রাজ্যে বেশ কয়েকজন আলুচাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০০৬-০৭ সালে ধসা রোগের আক্রমণে এবং গত বছর ফসলের দাম না পেয়ে চূড়ান্ত সঙ্কটে পড়েছিল আলুচাষিরা। এ বছরেও ধসা রোগে আলুচাষ ভীষণভাবে মার খাওয়ায় চাষিদের বাঁচার সব রাস্তাই প্রায় বন্ধ। যারা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অথবা স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে চাষ করেছিল, তাদের দুর্দশা চরমে উঠেছে। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও এ রাজ্যের সিপিএম সরকার নির্বিকার।

এই অবস্থায় মুখ বুঁজে পড়ে পড়ে মার খেতে রাজি নয় চাষিরা। তারা গড়ে তুলেছে সংগ্রামের হাতিয়ার ‘সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটি’। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন তাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, দেশি-বিদেশি পুঁজিমালিকদের পায়ে বিকিয়ে যাওয়া এই সরকারের কাছ থেকে বাঁচার দাবি আদায় করতে হলে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে একজোট হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে তীব্র আন্দোলন। সেই প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ সুরই শোনা গেল সম্মেলনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের কথায়।

কী বললেন আলুচাষিরা? হুগলির শেখ সিরাজুদ্দিন, বর্ধমানের জয়ব্রত পাল, শেখ খোদাবক্স, শামসুল আহমেদ থেকে শুরু করে কোচবিহারের বিবেকানন্দ মজুমদার কিংবা বীরভূমের অসিত মজুমদার — সকলের মুখেই শোনা গেল আলুচাষিদের মর্মান্তিক দুরবস্থার কাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই সারের ব্যাপক কালোবাজারি চলছে। সরকার ও প্রশাসনের মদতে সার ব্যবসায়ীরা বেআইনি ভাবে সরকারি দামের চেয়ে কোথাও ১০০ টাকা, কোথাও ২০০ টাকা বেশি নিয়ে লুঠের রাজত্ব চালিয়েছে, একটি সার কিনলে সঙ্গে আরও একটি কেনার শর্ত চাপিয়েছে। অবাধে পাচার করেছে বিপুল পরিমাণ সার। অস্বাভাবিক চড়া দাম দিয়ে উপযুক্ত মানের বীজের বদলে রোগগ্রস্ত ও ভেজাল আলুবীজ কিনতে হয়েছে চাষিকে। বীজ নিয়েও চলেছে ব্যাপক কালোবাজারি। ধসার সুযোগ নিয়ে কীটনাশক ব্যবসায়ীরা চাষিকে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে প্ররোচিত করে দেদার মুনাফা লুটেছে। এদিকে ভেজাল কীটনাশকে বাজার ছেয়ে গেছে। বাজারের থেকে বহুগুণ বেশি দামে ওষুধ কিনেও ধসার সংক্রমণ ঠেকাতে পারেনি চাষিরা। ব্যাঙ্ক থেকে সময় মতো প্রয়োজনীয় ঋণ পাচ্ছে না আলুচাষি। আন্দোলনের চাপে সরকার গত বছরের ঋণের সুদ মকুব করে এ বছর নতুন করে চাষিকে ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও প্রশাসনিক জটিলতায় চাষি ব্যাঙ্কঋণ পাচ্ছে না। ফলে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হচ্ছে। বহু জেলাতেই রয়েছে জলের অভাব। অথচ সেচের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের দাম ক্রমেই বাড়ছে। এর ওপর অকালবর্ষণ কিংবা ধসার আক্রমণ হলে একেবারে পথে বসতে হচ্ছে আলুচাষিকে। এইভাবে প্রবল ঝুঁকি বহন করে, রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে যে ফসল চাষি তৈরি করে, তার দাম ঠিক করার ক্ষমতা তার নেই। উপযুক্ত সরকারি বিপণন ব্যবস্থার অভাবে জলের দরে সেই ফসল চাষিকে বেচে দিতে হয় মুনাফাখোর ফড়ে, পাইকারদের হাতে। এই বৃহৎ মুনাফাচক্রই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। সারা বছর সংসার চালানোর সংস্থান করা দূরের কথা, বহু ক্ষেত্রে চাষের খরচটুকুও তুলতে পারে না আলুচাষি।

এই অসহনীয় অবস্থায় ‘জনদরদী’ সিপিএম সরকারের চূড়ান্ত কৃষকবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা। তাঁরা জানালেন, কৃষিমন্ত্রী সম্প্রতি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন — ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণের কোনও ভাবনা সরকারের নেই। বস্তুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূর অস্ত্, বছরের পর বছর ধরে আলুচাষিরা সঙ্কটের যে ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা থেকে তাদের বার করে আনার কোনও সদিচ্ছাই সরকারের নেই। আলুচাষিকে সাহায্য করার নামে সরকারি পদক্ষেপগুলিও প্রতারণামূলক, চালাকিতে ভরা। এগুলির দ্বারা সাধারণ চাষিরা নয়, উপকৃত হয় বৃহৎ মুনাফা চক্র। বাজার চাঙ্গা করার নামে অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানিকারকদের সরকার কুইন্টাল পিছু ২০ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। ভুয়ো রসিদ দেখিয়ে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ভর্তুকির পুরো টাকাটাই গ্রাস করেছে। আলুচাষি সংগ্রাম কমিটি গত জুন মাসে হিমঘরের ভাড়ায় ভর্তুকি দাবি করেছিল। আন্দোলনের চাপে সরকার সেই দাবি মেনে নিয়েছে। কিন্তু চালাকি করে সেই ভর্তুকি সরকার এমন সময়ে দিল যখন বেশিরভাগ আলুচাষিই হিমঘর থেকে আলু বার করে বিক্রি করে দিয়েছে। এক্ষেত্রেও ভর্তুকির সুবিধা পুরো মাত্রায় পেল বড় পাইকার এবং হিমঘর মালিকরা।

বড় ব্যবসায়ীদের সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার সরকারি নীতির তীব্র নিন্দা করে প্রতিনিধিরা বলেন, চাষির হাতে আলুর ন্যায্য দাম তুলে দেওয়ার সদিচ্ছা থাকলে সরকার পঞ্চায়েত স্তর থেকে অতি সহজেই সরাসরি চাষির আলু কিনতে পারত। তা না করে সরকারি সংস্থা ‘বেনফেড’ বড় ব্যবসায়ীর আলু কেনে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ মকুবের ঘোষণায় প্রকৃত অর্থে সাধারণ চাষিরা যেমন কোনও সুবিধা পায়নি, একইভাবে এ রাজ্যের সিপিএম সরকারের গত বছরের ঋণের সুদ মকুব করে ৫০ শতাংশ ঋণ দীর্ঘমেয়াদি করে ১০০ শতাংশ ঋণ দেওয়ার ঘোষণাও আলুচাষিদের হতাশ করেছে। বাস্তবে কোনও সুদই মকুব হয়নি এবং নির্দেশ না আসার অজুহাতে ব্যাঙ্কঋণও পায়নি আলুচাষিরা।

কৃষক সমাজের প্রতি সরকারের এই অপরাধমূলক অবহেলা এবং নির্মম দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা গর্জে উঠেছেন। বলেছেন — এই সরকার মানুষকে হত্যা করছে। একে খুনির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করতে হবে চাষিদের। ক্ষতিপূরণের দাবি আদায়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আলুচাষিদের একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন তাঁরা; সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনের জোয়ারে সরকারি নেতা-মন্ত্রী ও আমলাদের ঠাণ্ডা ঘরের আরাম বিলাসকে ভাসিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়েছেন। বড় শিল্পপতিদের জন্য কৃষিজমি দখলের সরকারি ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করে দিয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন, গণআন্দোলনের চাপে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষিজমি দখলে ব্যর্থ হয়ে সরকার এমন ব্যবস্থা করছে যাতে কৃষিকাজ চালানো চাষির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুতের আকাশছোঁয়া দাম দিতে না পেরে চাষি যাতে বড় শিল্পপতিদের কাছে জমি বেচে দিতে বাধ্য হয় — সরকার সেই চেষ্টাই করছে। এর বিরুদ্ধে বাঁচার তাগিদে সঠিক দিশায় চাষিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক উঠেছে আলুচাষিদের সম্মেলনে। সম্মেলন থেকে ধসায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও অবিলম্বে আলুর ন্যায্য সহায়ক মূল্য ঘোষণা সহ অন্যান্য দাবিতে ১২ ফেব্রুয়ারি মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং আহ্বান জানানো হয়েছে আগামী ৯ মার্চ কলকাতায় কৃষক ও খেতমজুরদের লাগাতার অবস্থান আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য ।

পরিশেষে শঙ্কর ঘোষ ও প্রদ্যুৎ চক্রবর্তীকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে ৪৩ জনের একটি রাজ্য কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

লালগড় ঃ সাংবাদিক সম্মেলন

ছয়ের পাতার পর

বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল সুভাষ বোস সূর্য সেনদের বাংলাকে আজ কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএম!

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমরা তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্যে আছি, ঐক্যে থাকব। আমরা এ কথাও বলেছি, তৃণমূল যদি ভুল করে কংগ্রেসের সঙ্গে যায়, তবে আমাদের মধ্যে বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ ঘটবে, আন্দোলন হলে আবার ঐক্য হবে। রাজ্যবাসীকে আমি বলতে চাই, ’৭৭ সালে স্লোগান উঠেছিল, কংগ্রেসকে তাড়িয়ে সিপিএমকে আনো। এখন স্লোগান হচ্ছে সিপিএমকে তাড়িয়ে যে কোনও দলকে আনো। এই রাজনীতিতেই মানুষ বারবার মার খাচ্ছে। বাঘ তাড়াতে গিয়ে খাল কেটে কুমীর আনা — এটা কোনও রাজনীতি নয়। একসময় স্বদেশী আন্দোলনে গান্ধীজিকে অবতার করে তোলা হয়েছিল। ফলে সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে তাড়ানো হল। তার মূল্য আজও দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে। এইসব ভুল যেন আর না হয়। আমরা একটা মার্কসবাদী দল, আমরা গণআন্দোলনে বিশ্বাস করি। গণআন্দোলনের স্বার্থেই আমরা তৃণমুলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমরা এ কথাও খোলাখুলি ঘোষণা করেছি, তৃণমূল যদি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, প্রয়োজন হলে আমরা লোকসভা ভোটে কোনও সিটে দাঁড়াব না। আমাদের ১০ হাজার কর্মী, যারা গুলির মুখে দাঁড়িয়ে লড়ে, গণআন্দোলনের স্বার্থে তারা তৃণমূলের হয়ে কাজ করবে। এ কথা আমরা আগেও বলেছি, আজও বলছি।

আমাদের কোনও ভোটব্যাঙ্ক নেই, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিও আমরা করি না। আমাদের আন্দোলনের ব্যাঙ্ক আছে, সে ব্যাঙ্ক হচ্ছে জনগণের সমর্থন — যে শক্তির জোরে আমরা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির পুনঃপ্রবর্তন করিয়েছি, বহু দাবি আদায় করেছি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে আন্দোলনের জয়ের পিছনে আমাদের দলের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তৃণমূলও আন্দোলনে ছিল। আমরা যুক্তভাবে লড়েছি। আমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করি। আজও লালগড়ের আন্দোলনের পাশে আছি। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব, ভোট পাই আর না পাই।

আমাদের দলের কৃষকসংগঠন অল ইন্ডিয়া কে কে এম এস-এর পশ্চিমবঙ্গ কমিটির ডাকে ৯ মার্চ কলকাতায় লক্ষাধিক গ্রামীণ মানুষ আসবে, লাগাতার অবস্থান করবে। আমরা সরকারকে বলেছি, হয় চাষীদের দাবি মানো, না হয় গুলি চালাও। একই সাথে লালগড়ের মানুষের দাবি নিয়েও আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

প্যারামেডিকেল স্টাফ এমপ্লয়িজ কনভেনশন

বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম ও ডায়গনিস্ট সেন্টারে কর্মরত প্যারা মেডিকেল স্টাফ ও কর্মচারীদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল ১৮ জানুয়ারি কলকাতার স্টুডেন্টস হলে। পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, ডাঃ তিমির দাস, টেকনিশিয়ান রেখা গোস্বামী, মনোরঞ্জন বায়েন, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড দীপক দেব। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। কনভেনশনে ‘সারা বাংলা প্যারা মেডিকেল স্টাফ অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন’ গঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে কমরেড মানস মুখার্জী ও কমরেড শান্তি ঘোষ।

আন্দোলনের চাপে তমলুক পুরসভায় জলকর স্থগিত

সম্প্রতি তমলুক পুরসভায় কোনও রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই জলকর গৃহস্থদের ক্ষেত্রে ১০ টাকা এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ২০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। প্রতিবাদে তমলুক পৌরনাগরিক সমিতি ২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখায়। জলসরবরাহের সময় ৪৫ মিনিট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, জলের কানেকশন ফি ৪০০০ টাকা ও তৎকাল প্রকল্পে ১০,০০০ টাকা। প্রশ্ন ওঠে, পুরকর মানেই হল ‘কনসোলিটেড কর’ তা সত্ত্বেও জলকর কেন নেওয়া হবে? প্রতিনিধিরা বলেন, মেদিনীপুর পুরসভা জলকর নিচ্ছে না, তমলুক পুরসভা কেন জলকর নেবে? নাগরিক বিক্ষোভের চাপে ভাইস চেয়ারম্যান প্রতিনিধিদের বলেন, জলকর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকছে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি বিনয় রায়চৌধুরী, যুগ্মসম্পাদক শ্যামাপদ কয়েল, মানব বেরা, সহসভাপতি স্বদেশরঞ্জন ভৌমিক, অফিস সম্পাদক অশোকতরু প্রধান।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

বাংলাদেশ হাইকমিশনে বিক্ষোভ

DSO
MSS
DYO
DSO
KOMSOMOL
শহীদ প্রীতিলতার স্মৃতিবিজড়িত
স্কুলকে বাণিজ্যিক ভবনে পরিণত করার
প্রতিবাদে
বাংলাদেশ
দূতাবাসে
বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন
AIDSO · AIDYO · AIMSS

চট্টগ্রামে যে স্কুলে শহীদ প্রীতিলতা প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন, যে স্কুলের সাথে তাঁর নাম ও গৌরব জড়িত হয়ে আছে, সেই স্কুল ভেঙে বহুতল ব্যবসাকেন্দ্র করার পরিকল্পনা নেয় চট্টগ্রাম পৌরসভা। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রামে আন্দোলন শুরু হয়, যার সমর্থনে ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ডি এস ও, ডিওয়াই ও, এম এস এস, কমসোমল প্রভৃতি সংগঠন বাংলাদেশ হাইকমিশনে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি প্রদান করে।

লাইসেন্সের দাবিতে ও পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে

মোটরভ্যান চালকদের মহাকরণ অভিযান

মোটরভ্যান চালকদের মহাকরণ অভিযান সাড়া ফেলে দিল কলকাতা শহরে। শহরাঞ্চলে এর প্রচলন না থাকলেও গ্রামে অন্যান্য যানবাহন না থাকায় মোটরভ্যানে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাত্রী পরিবহন চলে, চলে মাল পরিবহনও। এ রাজ্যের বহু রাস্তায় মোটরভ্যানই একমাত্র ভরসা। পশ্চিমবাংলার ৮০ হাজার গ্রামীণ গরিব মানুষ এই পেশায় যুক্ত। এদের পরিবার-পরিজনদের ধরলে কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন এর ওপর নির্ভরশীল। পেনশন, জীবন বিমা বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের মতো সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা দূরের কথা, সরকার এই মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স পর্যন্ত দিচ্ছে না। লাইসেন্স না থাকায় মোটরভ্যান চালকদের যখন তখন পুলিশি জুলুমের শিকার হতে হয়। সামাজিক সুরক্ষা আদায়ে ও পুলিশি জুলুম বন্ধের দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৬ ফেব্রুয়ারি মহাকরণ অভিযান করে হাজার হাজার মোটরভ্যান চালক। ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯ টাকা করার দাবিও জানায় তারা।

মহাকরণ অভিযান
সারা বাংলা মোটর ভ্যান চালক ই

মঞ্চে উপবিষ্ট বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

অন্য কোনও কাজেরই সংস্থান করতে না পেরে সংসার চালানোর তাগিদে এ রাজ্যের বহু খেটে খাওয়া মানুষ, কেউ গরু-ছাগল বিক্রি করে, কেউ জমি বিক্রি করে ভ্যান রিকসা কিনেছেন। দু'বেলা হাড়ভাঙা খাটুনির পর যা রোজগার হয় তাতে কষ্টে-সৃষ্টে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকে ভ্যানচালকরা। আপদে-বিপদে, দুর্ঘটনা ঘটলে কোনও সরকারি সাহায্য তো তারা পায়ই না, উপরন্তু চলে লাইসেন্স না থাকার অজুহাতে পুলিশি হয়রানি ও জোর করে অর্থ আদায়। না দিতে পারলে গাড়ি আটক করে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দেয় পুলিশ। আটক ভ্যান ছাড়াতে বহু সময় ৫০০০ থেকে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এই অবস্থায় দাবি আদায়ের লড়াই জোরদার করতে ভ্যানচালকরা গড়ে তুলেছে 'সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন'। ২০০৬ সালে গঠিত এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলনের চাপে ইতিপূর্বে পরিবহনমন্ত্রী বাধ্য হয়েছেন লাইসেন্স দেওয়ার দাবি মেনে নিতে। কিন্তু এখনও লাইসেন্স পায়নি ভ্যানচালকরা।

সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মোটরভ্যান চালকরা এ দিন মিছিল করে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী। দাবি পূরণে সরকারকে বাধ্য করতে তাঁরা রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রীর কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কমরেড অশোক দাস সহ ৪ জনের একটি প্রতিনিধিদল পরিবহনমন্ত্রীর কাছে মোটরভ্যান চালকদের দাবিদাওয়া পেশ করেন। পরিবহনমন্ত্রী আগামী মার্চ মাসের বিধানসভা অধিবেশনে এ বিষয়ে অর্ডিন্যান্স আনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। মন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির কথা সমাবেশে ঘোষণা করা হলে দাবি আদায়ের সাফল্যে উপস্থিত ভ্যানচালকরা উল্লসিত হয়ে ওঠে। মন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি না রাখলে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে জেলায় জেলায় এবং রাজ্যব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করেছে মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন।

সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরতের দাবিতে জনসভা

সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি জয়মোল্লা থেকে খাসের চক পর্যন্ত টাটার প্রস্তাবিত কারখানার সামনে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির বিশাল মিছিল হয়। জমিহারা কৃষক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সাধারণ মানুষও সামিল হয়েছিলেন এই মিছিলে। মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, এস ইউ সি আই নেতা সদানন্দ বাগল, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শঙ্কর জানা ও বেচারাম মান্না, সৌগত রায়, মুকুল রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। খাসের চকে মিছিল পৌঁছলে সেখানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন মমতা ব্যানার্জী, সদানন্দ বাগল, সৌগত রায়, পূর্ণেন্দু বসু, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে আসানসোলে শিক্ষা কনভেনশন

মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজির সাথে সাথে উর্দুভাষাতেও দেওয়া, এলাকায় উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ সায়েন্স, আর্টস ও কমার্স বিভাগ চালুর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল খোলা, এলাকার সমস্ত উর্দু মাধ্যম স্কুলে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা, এলাকাতে উপযুক্ত সংখ্যক গার্লস স্কুল খোলা এবং উর্দু স্কুলে ভালো বই সরবরাহের দাবিতে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ স্ট্রাগল কমিটির ডাকে আসানসোলে ১ ফেব্রুয়ারি রহমিয়া উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আসানসোল, কুলটি, অন্ডাল, রাণীগঞ্জের বিভিন্ন স্কুল থেকে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে। শুরুতে কমিটির রাজ্য সম্পাদক ইমতিয়াজ আলম কনভেনশনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করেন। বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা। ছাত্র-ছাত্রীরাও বক্তব্য রাখেন। মূল বক্তা কমিটির রাজ্য সভাপতি আয়সানুল হক তাঁর বক্তব্যে উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীরা গোটা রাজ্য জুড়ে কীভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকার কীভাবে তাদের থেকে শিক্ষার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নিতে চাইছে — তা তুলে ধরেন এবং দেখান যে, আন্দোলনই এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র রাস্তা। শেষে বিভিন্ন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের উপদেষ্টা করে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী আসানসোল মহকুমা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। এবং আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি আসানসোলের মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ এবং বিক্ষোভের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

রাজ্য সরকারের মদের ঢালাও লাইসেন্সের নীতির প্রতিবাদে
৪ ফেব্রুয়ারি রাইটার্সের সামনে এ আই ডি ওয়াই ও-র বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in